নাট্যপ্রতিভা সিরিজ

চতুর্থ সংখ্যা।

বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী।

সম্পাদক—

সিটি কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক,

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ,

বি, এ (কলিকাতা), এম্, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)।

১লা ফাল্গুন, ১৩২৬।

শিশির পাব্লিশিং হাউস্,
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট,
কলিকাতা।

১৲ টাকা মাত্র।

বিনোদিনী।

প্রথম লহরী

বাল্যজীবন ও রঙ্গালয়ে প্রবেশ।

বঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যখন প্রথম স্ত্রীচরিত্রাভিনয়ের জন্য অভিনেত্রীর আহরণ আরম্ভ হইয়াছিল সেই সময়ে যে স্বল্প কয়েকজন অভিনেত্রী বিশিষ্টরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, শ্রীমতী বিনোদিনী তাহাদের অন্যতমা। বিনোদিনী বহু চেষ্টায় ও অদম্য অধ্যবসায়ে এবং সর্ব্বোপরি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে কালে একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল। বস্তুতঃ বঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হইবার পর যে কয়জন অভিনেত্রী নাট্যকলার চরম বিকাশ প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে শ্রীমতী বিনোদিনী তাহাদের অগ্রণী। ফলতঃ বঙ্গরঙ্গালয় স্থাপিত হইবার প্রথম যুগে শ্রীমতী বিনোদিনীই ছিল গিরিশচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত। সে সময় গিরিশচন্দ্র যে সমস্ত নাটক রচনা করিয়াছিলেন বিনোদিনীই তাহাদের নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং প্রতি ভূমিকা সজীব করিয়া তুলিয়া দর্শক মণ্ডলীর

অশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। শ্রীমতী বিনোদিনী "আমার কথা" নাম দিয়া একখানি নিজের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। সে তাহার সেই 'আমার কথা' পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছে ;—

"রঙ্গালয়ে আমি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলাম। তাঁহার প্রধানা ও প্রথমা ছাত্রী বলিয়া এক সময়ে নাট্যজগতে আমার বেশ গৌরব ছিল। আমার অতি তুচ্ছ আবদারও রাখিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন।" এইটুকু পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় বঙ্গরঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনীর স্থান কত উচ্চে ছিল। আমাদের পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকেই বিনোদিনীর নামের সহিত পরিচিত আছেন। আমরা এক্ষণে বিনোদিনী কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অভিনেত্রীর শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিব।

অনুমান ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী বিনোদিনী কলিকাতার কোন এক নিন্দিত পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করে। বিনোদিনীর শৈশব জীবন বড় সুখের ছিল না, কারণ সে যেস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেখানে অভাব পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বদা বিরাজিত ছিল, অধিক বলিতে কি, কোন ক্রমে তাহাদের দিন গুজরাণ হইত। বিনোদিনীর মাতামহীর নিজের একখানি বাড়ী ছিল, তাহাতে কয়েকখানি খোলার ঘর ছিল। সেই ঘর কয়খানিতে কয়েকটী ভাড়াটিয়া ছিল, তাহা হইতে যে সামান্য ভাড়া উঠিত তাহাতেই বিনোদিনীর মাতামহী অতি কষ্টে সংসার চালাইতেন। বিনোদিনীদের সংসারে কেবলমাত্র চারিটী লোক ছিল ঃ—তাহার মাতামহী, তাহার মাতা, সে ও তাহার একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কাজেই ক্ষুদ্র সংসার কোন ক্রমে সেই যৎসামান্য আয়েই কষ্টে সৃষ্টে একরূপ চলিয়া যাইত।

বিনোদিনী

বিনোদিনীর মাতামহীর সংসার কোনক্রমে এতদিন চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বিনোদিনীর বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর তখন তাহাদের দারিদ্র-ক্লেশ পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। শেষে এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল যে সংসার আর চলে না। তখন তাহার মাতামহী তাহার ভ্রাতার সহিত একটী মাতৃহীনা আড়াই বৎসরের বালিকার বিবাহ সংস্কার সম্পাদিত করিয়া যৌতুকরূপে সেই বালিকার মাতার কয়েকখানি অলঙ্কার গৃহে তুলিলেন। এই বিবাহের পর ঐ অলঙ্কার কয়খানিতে আবার তাহাদের সংসার স্বচ্ছল হইল। তখন সেই অলঙ্কার এক একখানির বিক্রয় লব্ধ অর্থে তাহাদের সংসার চলিতে লাগিল। বিনোদিনী এই সম্বন্ধে তাহার বিরচিত "আমার কথায়" যাহা লিখিয়াছে তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমার মাতামহী একটী মাতৃহীনা আড়াই বৎসর বয়সের বালিকার সহিত আমার পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ভ্রাতার বিবাহ দিয়া তাহার মাতার যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কারাদি ঘরে আনিলেন। তখন অলঙ্কার বিক্রয়ে আমাদের জীবিকা চলিতে লাগিল, কারণ ইহার পূর্ব্বেই মাতামহীর ও মাতাঠাকুরাণীর যাহা কিছু ছিল, তাহা সকলই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। * * * * * * * আমার মাতামহী ও মাতাঠাকুরাণী বড়ই স্নেহময়ী ছিলেন। তাঁহারা স্বর্ণকারের দোকানে এক একখানি করিয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া আমাদের হাতে দিতেন। অলঙ্কার বিক্রয়ের জন্য কখনও দুঃখ করিতেন না। * * * * * আমার সেই সময়ের একটী কথা মনে পড়ে। আমার যখন বয়স মাত্র সাত বৎসর তখন আমার মাতা কাহাদিগের কর্ম্ম বাড়ী গিয়া আমাদের জন্য কয়েকটী সন্দেশ চাহিয়া আনিয়াছিলেন। অনুগ্রহের দান কিনা, তাহাতেই দশ পনর দিন তুলিয়া

রাখিয়া, ময়া কাটাইয়া আমার মাতার হাতে দিয়াছিলেন। এখন হইলে সে সন্দেশ দেখিলে অবশ্য নাকে কাপড় উঠিত। আমার মাতা তাহা বাটীতে আনিয়া আমাদের তিন জনকে আনন্দের সহিত খাইতে দিলেন। পাছে সেই দুর্গন্ধ সন্দেশ শীঘ্র ফুরাইয়া যায় সেই জন্য অতি যত্ন সহকারে উহা খাইতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। এই আমার সুখের বাল্যকালের ছবি।"

বিনোদিনীর ভ্রাতা শৈশবেই ইহ সংসার পরিত্যাগ করে। তাহার বিবাহের অল্পদিন পরেই সে অসুস্থ হইয়া পড়ে ও সেই অসুস্থতা হইতে সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। বিনোদিনীদের অবস্থা তখন নিতান্তই মন্দ, এমন পয়সা ছিল না যে ভ্রাতার চিকিৎসা করায়। কাজেই তাহার মাতামহী তাহাদের কয়েকজন প্রতিবাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র নাতিটিকে চিকিৎসার জন্য এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে লইয়া গেলেন। তথায় কিছুকাল রোগ ভোগ করিয়া বিনোদিনীর ভ্রাতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। বিনোদিনীর ভ্রাতার মৃত্যুতে তাহার মাতা ও মাতামহী উভয়েই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাহার মাতা তো একেবারে উন্মত্ত হইয়া গেলেন। বিনোদিনীর ভ্রাতার মৃত্যু সম্বন্ধে বিনোদিনী লিখিয়াছে,—

"আমার ভ্রাতা অতি অল্প বয়সেই আমার মাতাকে চির দুঃখিনী করিয়া এ নারকীদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। আমার ভ্রাতার মৃত্যুতে আমার মাতামহী ও মাতাঠাকুরাণী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। আমার ভ্রাতা অসুস্থ হইলে অর্থের অভাবে তাহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইতে হয়। আমরা দুইটী ক্ষুদ্র বালিকা বাটীতে থাকিতাম।

আমাদের একটী দয়াবতী প্রতিবেশিনীর জন্য আহারাদির কোন কষ্ট হইত না। তিনি আমাদের সঙ্গে করিয়া আমার মাতা ও মাতামহীর আহার লইয়া ডাক্তারখানায় যাইতেন। কোন কোন দিন তাঁহাদের আহার করিবার জন্য বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিজে আমার ভ্রাতার নিকটে বসিয়া থাকিতেন। পরে আবার তাঁহারা আহার সমাপন করিয়া সেইখানে যাইলে আমাদের সঙ্গে করিয়া বাটী আসিতেন। কেবল আমাদের বলিয়া নহে তিনি স্বভাবতই পরোপকারিণী ছিলেন। * * * * * * * * *
উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে আমার ভ্রাতার মৃত্যু হয়। সে দিন আমার স্মৃতিপটে জাজ্জ্বল্যমান আছে। তখন ভাবিতে লাগিলাম আমার ভাই আবার আসিবে না কি ? যমে নিলে যে আর ফিরাইয়া দেয় না, তখন উহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। আমার মাতামহী আমার ভ্রাতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি অতিশয় ধৈর্য্যশালিনী ছিলেন। তাঁহার শোনা ছিল ডাক্তারখানায় মরিলে, মড়া কাটে, গতি করিতে দেয় না। যেমনই আমার ভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিল, অমনি তিনি সেই মৃতদেহ বুকে করিয়া তিন তলার উপর হইতে তড়্ তড়্ করিয়া নামিয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে যেন ছুটিলেন। আমরা আমার মাতার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী কেমন বিকৃত-হৃদয় হইয়াছিলেন। তিনি হা হা করিয়া মাঝে মাঝে হাসিতে লাগিলেন। আমাদের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারখানার বড় ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, “ব্যস্ত হইও না, আমরা ধরিয়া রাখিব না।” কিন্তু দিদিমাতা তাহা শুনিলেন না, তিনি একেবারে কোলে করিয়া লইয়া গঙ্গার তীরে মৃত দেহ শয়ন করাইয়া দিলেন। গঙ্গার উপরেই সেই ডাক্তারখানা। তখন একজন ডাক্তার সেই

স্থান পর্য্যন্ত দয়া করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, এখনই সৎকার করিও না, কয়েকটী বিষাক্ত ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, আমি আবার আসিতেছি। পরে তাঁহারা এক ঘণ্টা কাল গঙ্গা তীরে সেই মৃতদেহ কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন। সেই ডাক্তার বাবু আসিয়া আবার অনুমতি দিলে তবে কাশীমিত্রের ঘাটে আনিয়া তাকে চিতায় শয়ন করান হয়। ইতিমধ্যে আমাদের সেই দয়াবতী প্রতিবেশিনী তথায় উপস্থিত হন। তিনি বাটী হইতে কিছু অর্থ আনিতে গিয়াছিলেন। ভ্রাতার অবস্থা খারাপ দেখিয়া তার আগের রাত্রে আমি ও ভ্রাতৃবধূ সেইখানেই ছিলাম। এর ভিতর আর একটী দুর্ঘটনা ঘটিতে ঘটিতে রক্ষা হয়। ভ্রাতার সৎকারের জন্য আমার মাতামহী ও সেই প্রতিবেশিনী যখন ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় আমার মা আস্তে আস্তে গঙ্গার জলে কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলেন। আমি মার কাপড় ধরিয়া খুব চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকায় আমার দিদিমাতা ছুটিয়া আসিয়া মাতাকে ধরিয়া লইয়া যান। ইহার পর মা অনেক দিন অর্দ্ধ উন্মত্ত অবস্থায় ছিলেন, মোটে কাঁদিতেন না, বরং মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেন। সে কারণ আমার দিদিমাতা বড়ই সাবধান ছিলেন। মায়ের সম্মুখে কাহাকেও আমার ভ্রাতার কথা কহিতে দিতেন না। যদিও আমার দিদিমাতা আমাদের সকলের অপেক্ষা আমার ভ্রাতাকে অধিক স্নেহ করিতেন, কেন না আমাদের বংশে পুত্র সন্তান কখনও হয় নাই,—মেয়ের মেয়ে, তাহার মেয়ে নিয়েই যত ঘর, তথাপি নিজ কন্যার অবস্থা দেখিয়া তিনি একেবারে চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। এক দিন রাত্রে আমরা সকলে শুইয়া আছি, আমার মা, "ওরে বাবারে কোথা গেলিরে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। আমার দিদিমাতা বলিলেন, "আঃ

বাঁচিলাম।" আমি মা মা করিয়া উঠিতে দিদিমাতা বলিলেন, "চুপ, চুপ, উহাকে কাঁদিতে দে।" আমি ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু আমারও বড় কান্না আসিতে লাগিল।"

বিনোদিনীর বিবাহ হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় একটী সুন্দর বালকের সহিত। সে যখন অতি বালিকা তখন তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু সে বিবাহ কেবল নামমাত্র হইয়াছিল। স্বামীর ঘর তাহাকে কোন দিন করিতে হয় নাই, আর তাহার স্বামীও কোন দিন তাহার নিকট আসে নাই। বিনোদিনীর এক মাসী-শাশুড়ী ছিলেন তিনিই তাহার স্বামীকে লইয়া যা'ন ও আর কখনও আসিতে দেন নাই। বিনোদিনীর স্বামীকে আনিবার জন্য তাহার মাতামহী অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, ও তাহাকে তাঁহার বাটীতে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা একেবারেই বৃথা হইয়াছিল। বিবাহসম্বন্ধে বিনোদিনী যাহা লিখিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বিনোদিনী লিখিয়াছে,—

"শুনিয়াছি আমারও বিবাহ হইয়াছিল এবং এ কথাও যেন মনে পড়ে যে আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় একটী সুন্দর বালক ও আমার ভ্রাতা, বালিকা ভ্রাতৃবধূ এবং অন্যান্য প্রতিবেশিনী বালিকা সকলে মিলিয়া আমরা একত্রে খেলা করিতাম। সকলে বলিত ঐ সুন্দর বালকটী আমার বর। কিছুদিন পরে আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই। * * * * লোক-পরম্পরায় শুনিলাম যে তিনি বিবাহাদি করিয়া সংসার করিতেছেন, এক্ষণে তিনিও আর ইহ সংসারে নাই।"

অনুমান ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যখন বিনোদিনীর বয়স কেবল মাত্র নয় বৎসর সেই সময় তাহাদের বাটীতে একটী গায়িকা আসিয়া বাস করে। পূর্ব্বেই

বলিয়াছি বিনোদিনীর মাতামহীর কয়েকখানি খোলার ঘর ছিল। উহার ভিতর একখানি পাকা একতলা গৃহও ছিল। নবাগতা গায়িকা সেই ঘরখানি ভাড়া লইয়াছিল। যে গায়িকাটী আসিয়া বিনোদিনীদের বাটীতে বাস করিতেছিল, তাহার আপনার বলিতে পৃথিবীতে কেহ ছিল না। বিনোদিনীর মাতামহী তাহাকে নিজের কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। এই গায়িকার নাম গঙ্গা বাইজী। এই গঙ্গাই এক দিন ষ্টার থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা হইয়াছিল। এই গঙ্গা আসিয়া বিনোদিনীদের বাটীতে কিছু দিন বাস করিবার পর বিনোদিনীর সহিত তাহার বড় ভাব হইয়াছিল, তাহারা পরস্পরে "গোলাপ ফুল" পাতাইয়াছিল।

বিনোদিনীর মাতামহী অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পূর্ব্বকথিত গঙ্গামণির নিকটে বিনোদিনীকে গান শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করে। বিনোদিনী প্রায়ই সেই জন্য তাহার গৃহে থাকিত। সে সময়ে তাহার গান শিক্ষা যত হউক আর না হউক গঙ্গার নিকট তখন যে সকল ভদ্র লোক আসিতেন তাঁহাদের গল্প শোনাই হইয়াছিল বিনোদিনীর প্রধান কার্য্য। সুশ্রী, চতুর, ছোট মেয়েটীকে গঙ্গা বাইজীর গৃহে যে সকল ভদ্রলোক আসিতেন তাঁহারা সকলেই স্নেহ ও যত্ন করিতেন। কাজেই বালিকা বিনোদিনী তাহাদের আদর যত্নে ভুলিয়া সর্ব্বদাই গঙ্গা বাইজীর গৃহে থাকিতে ভালবাসিত। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বিনোদিনী যাহা লিখিয়াছে, আমাদের পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"* * * আমাদের বাটীতে একটী গায়িকা বাস করিতেন। আমাদের বাটীতে একখানা পাকা একতলা ঘর ছিল সেই ঘরে তিনি থাকিতেন। তাঁহার পিতা মাতা কেহ ছিল না। আমার মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে

কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার নাম গঙ্গা বাইজী। * * * * * তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় উন্নত ও উদার ছিল বলিয়া আমার মাতামহী ও মাতাকে বড়ই সম্মান করিতেন। এখনকার দিনে অনেক লোক বিশেষ উপকৃত হইয়াও ভুলিয়া যায় ও উহা স্বীকার করিতে লজ্জা এবং মানের হানি মনে করে, কিন্তু "গঙ্গামণি" ষ্টার থিয়েটারে গায়িকা ও অভিনেত্রীর উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াও সম্পূর্ণ অহঙ্কারশূন্যা ছিলেন। সেই উন্নতহৃদয়া বাল্য-সখী স্বর্গগতা গঙ্গামণি আমার বিশেষ সম্মান ও ভক্তির পাত্রী ছিলেন।"

গঙ্গামণি ব্যতীত বিনোদিনীদের বাটীতে আরও কয়েকটী ভাড়াটিয়া ছিল। তাহাদের আচার ব্যবহার অতিশয় নিকৃষ্ট ছিল। এমন দিন ছিল না যে তাহাদের ঘরে কলহ ও মারামারি হইত না। নরকের যাহা কিছু বীভৎস ব্যাপার তাহাদের ঘরে প্রতি রাত্রেই তাহার উৎকট অভিনয় হইত। ইহার ভিতর থাকিয়াও যে বিনোদিনী একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হইতে পারিয়াছিল এটা যে বিনোদিনীর প্রতি ভগবানের বিশেষ করুণা সে বিষয়ে ন্যূনমাত্র সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে 'আমার কথার' এক স্থানে বিনোদিনী লিখিয়াছে; "আমি বাল্যকাল হইতেই আমাদের বাটীর ভাড়াটিয়াদের রকম সকমের প্রতি কেমন বিতৃষ্ণ ছিলাম। যাহারা আমাদের খোলার ঘরে ভাড়াটিয়া ছিল, তাহারা যদিও বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ নহে, তবুও স্ত্রী পুরুষের মত ঘর সংসার করিত, দিন আনিত দিন খাইত এবং সময়ে সময়ে এমন মারামারি করিত যে দেখিলে বোধ হইত বুঝি আর কখনও তাহাদের বাক্যালাপ হইবে না, কিন্তু আমি দেখিতাম পরক্ষণেই পুনরায় উঠিয়া আহারাদি ও হাস্য পরিহাস করিত। আমি তখন অতিশয় বালিকা ছিলাম, এবং তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত

হইয়া যাইতাম। মনে হইত, আমি কখনও এরূপ ঘৃণিত হইব না। তখন জানি নাই যে আমার ভাগ্যদেবতা আমার মাথার উপর কাল মেঘ সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। তখন মনে করিতাম বুঝি এমনি মাতৃকোলে সুখস্বপ্নে চির দিন কাটিয়া যাইবে।"

গঙ্গামণির গৃহে দুইটী ভদ্রলোক প্রায়ই গান শুনিতে আসিতেন। ভদ্র লোক দুইটীর নাম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ শেঠ। তাঁহাদের মুখে বিনোদিনী গল্পচ্ছলে শুনিল যে তাঁহারা 'সীতার বিবাহ' নামক গীতি-নাট্যের অভিনয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গঙ্গার মুখে বিনোদিনীদের অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহারা একদিন বিনোদিনীর মাতামহীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "গঙ্গার মুখে শুনিলাম তোমাদের নাকি খুব কষ্ট। তা তোমরা এক কাজ করনা কেন,—তোমার এই নাতিনীটিকে থিয়েটারে দাও। এখন কিছু কিছু জলপানি পাবে, তারপর যখন অভিনয় করিতে পারিবে তখন বেশী বেতন হবে। তোমরা যদি রাজি থাক তাহা হইলে আমরা চেষ্টা করিয়া তোমার নাতিনীটীকে কোন একটা থিয়েটারে ঢুকাইয়া দিতে পারি।"

বিনোদিনীর মাতামহী সেই ভদ্র লোকদের কথার উত্তরে বলিলেন, "বাবারা, আমি এ কথার জবাব আজই দিতে পারি না, দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমাদের দুই এক দিনের মধ্যে জবাব দিব।"

বিনোদিনীর মাতামহী তাহার পরিচিত দুই চারিজন লোকের নিকট কি করা উচিত পরামর্শ লইয়া শেষে নাতিনীটিকে থিয়েটারে দেওয়াই মত করিলেন এবং শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বাবুকে সেই কথা জানাইলেন। পূর্ণ বাবু বিনোদিনীকে একটী থিয়েটারে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় কলিকাতাসহরে কেবলমাত্র দুইটী থিয়েটার ছিল। একটী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর "গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটার", অপরটী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষের "বেঙ্গল থিয়েটার।" সেই বৎসরই প্রথম কলিকাতার রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে যে সকল অভিনয় হইয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোক ছিল না। পূর্ণ বাবু অনেক চেষ্টা ও অনেক সুপারিস জোগাড় করিয়া বহু কষ্টে শ্রীমতী বিনোদিনীকে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর "গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে" দশ টাকা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেই হইতে বিনোদিনীর জীবনের স্রোত এক অভিনব লহরে প্রবাহিত হইল। সে সেই বালিকা বয়সে "গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে" ভর্ত্তি হইয়া বিলাস-বিমণ্ডিত লোক সমাজে এক অভিনব দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিচিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল। তখন তাহার নিকটে সকলই এক নবীন বর্ণে চিত্রিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিনোদিনী সে সময়ে থিয়েটারের কিছুই বুঝিত না, কিছুই জানিত না, কিন্তু যেরূপ সে শিক্ষা পাইত তাহা প্রাণপণ শক্তিতে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিত। তাহাদের সাংসারিক কষ্টের কথা বিনোদিনী একদিনের জন্যও ভুলিতে পারে নাই। মাতার মলিন মুখখানি যখনই তাহার মনে পড়িত তখনই তাহার কার্য্যের উৎসাহ আরও শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। সে সর্ব্বদাই এই কথা ভাবিত যদি এ সময় কিছু উপার্জ্জন করিতে পারি তাহা হইলে মায়ের অনেকটা কষ্ট লাঘব হইবে। বস্তুতঃ দুরবস্থাই জগতে অভ্যুন্নতির প্রকৃত সোপান।

দ্বিতীয় লহরী।

কৈশোরেই বিচিত্র প্রতিভাবিকাশ।

বিনোদিনী যে অদ্ভুত প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, উহার সে চরম বিকাশ প্রদর্শন করিয়াছিল ইহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। বিনোদিনী সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নাট্যমন্দির পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতেই প্রমাণ হইয়াছে বঙ্গ নাট্যশালায় শ্রীমতী বিনোদিনীর স্থান কোথায়! আমাদের পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"আমার প্রিয়তমা ছাত্রী সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীর নাম, যাঁহারা আমায় ভাল বাসেন এবং আমার রচিত নাটকাদি পাঠ করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই সকল মহাত্মাদিগের নিকট সম্পূর্ণ পরিচিত। "কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়" সে কথা সহজে ও সরল ভাষায় বুঝাইতে হইলে, বিনোদিনীর জীবনের কয়েকটী ঘটনা বিবৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করি। তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নিকট আমি সম্পূর্ণ ঋণী, এ কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। আমার "চৈতন্য লীলা", "বুদ্ধ দেব", "বিল্বমঙ্গল", "নলদময়ন্তী" প্রভৃতি নাটক যে সর্ব্বসাধারণের নিকট আশাতীত আদর লাভ করিয়াছিল, তাহার আংশিক কারণ, আমার প্রত্যেক

নাটকে শ্রীমতী বিনোদিনীর প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ও অভিনয়ে সেই সেই চরিত্রের চরমোৎকর্ষ বিশ্লেষণ। অভিনয় করিতে করিতে সে তন্ময় হইয়া যাইত, আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া এমন একটী অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত যে,সে সময় অভিনয় অভিনয় বলিয়া মনে হইত না,যেন সত্য ঘটনা বলিয়াই মনে হইত। বাস্তবিক সে ছবি এখনও আমার চক্ষের উপর প্রতিফলিত রহিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর অভিনেত্রী হইতে কেমন করিয়া সে অতি উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, কিরূপ সাধনা, কিরূপ প্রাণপণ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া সে সমগ্র বঙ্গবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা জানিবার বিষয় হইতে পারে। দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ যদিও বহুদিন যাবৎ কোনও রঙ্গালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, কিন্তু সে যে সুনাম, যে সুযশ, যে সুখ্যাতি, যে আদর, যে আপ্যায়ন সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিল, আদর্শ অভিনেত্রী বলিয়া সকল অভিনেত্রীর জিহ্বায় আজ পর্য্যন্ত যাহার নাম উচ্চারিত হয়, সুবিখ্যাত "ভারতবাসী" পত্রিকায় রঙ্গালয়সম্বন্ধে যাহার পত্রাবলী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, বঙ্গরঙ্গভূমির সে যে একটী স্তম্ভস্বরূপ ছিল এবং সে স্তম্ভচ্যুত হইয়া দেশীয় রঙ্গমঞ্চ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।"

বিনোদিনী থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহার ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে ও অসাধারণ প্রতিভাবলে অভিনয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিল। তাহার চেষ্টা ও যত্ন দেখিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়-গণের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। একে সে বালিকা, তাহাতে তাহার এরূপ আগ্রহ দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাহার উপরে বিশেষ যত্ন লইতে লাগিলেন; এবং দুই একটী করিয়া ভূমিকা তাহাকে

প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বালিকাবয়সেই বিনোদিনী নাট্য-কলার চরম বিকাশ দেখাইয়া তখনকার বড় বড় অভিনেত্রীদের সমান আসন গ্রহণ করিয়াছিল। থিয়েটারে প্রবেশ সম্বন্ধে বিনোদিনী লিখিয়াছে,—

"আমার দিদিমাতা দুই চারিটী লোকের সহিত পরামর্শ করিলেন। অবশেষে পূর্ণ বাবুর মতে থিয়েটারে দেওয়াই স্থির হইল। তখন পূর্ণবাবু আমাকে সুবিখ্যাত "ন্যাসন্যাল থিয়েটারে" দশ টাকা মাহিনাতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। গঙ্গা বাইজী যদিও একজন সুদক্ষ গায়িকা ছিলেন, কিন্তু লেখা পড়া কিছু মাত্র জানিতেন না। সেইজন্য আমার থিয়েটারে প্রবেশের বহুদিন পরে তিনি সামান্য মাত্র লেখাপড়া শিখিয়া অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, পরে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত অভিনেত্রীর কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।"

"যদিও রঙ্গালয়ে শিক্ষামত কার্য্য করিতাম বটে, কিন্তু আমার মনের ভিতর কেমন একটা জীবন্ত আকাঙ্ক্ষা সতত ঘুরিয়া বেড়াইত। মনে মনে ভাবিতাম আমি কেমন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র এই সকল বড় বড় অভিনেত্রীদের মত কার্য্য শিখিব। আমার মন সর্ব্বদাই সেই সকল বড় বড় অভিনেত্রীদের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। তখন সবেমাত্র চারি জন অভিনেত্রী ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ছিলেন:—রাজা, ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী ও নারায়ণী। ক্ষেত্রমণি আর ইহলোকে নাই। তিনি একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁহার অভিনয় কার্য্য এত স্বভাবিক ছিল যে লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। তাঁহার স্থান আর কখন পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ। "বিবাহ বিভ্রাটে" তাঁহার ঝীর অংশের অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং "ছোট লাট টমসন সাহেব" বলিয়াছিলেন আমাদের বিলাতেও যে এ রকম অভিনেত্রীর অভাব আছে। চৌরঙ্গীর কোন

সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে এক সময় অনেক বড় বড় সাহেব ও বাঙ্গালীর অধি-বেশন হইয়াছিল। সেই খানেই আমাদের থিয়েটারের বিবাহ বিভ্রাট অভিনীত হয়। তথায় তাঁহার অভিনয় ছোট লাট সাহেব দেখিয়াছিলেন। * * তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাদের ন্যায় অংশ অভিনয় করিতে পারিতাম।"

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় রঙ্গালয় গৃহে রিহার্সাল হইত না। অন্যত্র রিহার্সাল দিয়া পুস্তক অভিনয় উপযোগী হইলে, রঙ্গমঞ্চে উহার অভিনয় হইত। বিনোদিনী যখন ন্যাসন্যাল থিয়েটারে প্রবেশ করিয়াছিল সেই সময় উক্ত থিয়েটারের রিহার্সাল শ্রীযুক্ত রসিক নিয়োগী মহাশয়ের গঙ্গার ঘাটের উপর যে বাড়ী ছিল তাহাতে হইত। বাড়ীখানি একেবারে গঙ্গার কূলে, কাজেই বাড়ীখানির দৃশ্য বড়ই মনোহর ছিল। সে সময় ন্যাসন্যাল থিয়েটারে স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর ম্যানেজার ছিলেন ও স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র কর এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষক ছিলেন এবং বেলবাবু, মহেন্দ্র বাবু, অর্দ্ধেন্দু বাবু ও গোপাল বাবু প্রভৃতি প্রধান অভিনেতা ছিলেন। ইহা ব্যতীত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ও উক্ত থিয়েটারে অবৈতনিক ভাবে অভিনয় করিতেন।

শ্রীমতী বিনোদিনী যে সময় ন্যাসন্যাল থিয়েটারে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই সময় ন্যাসন্যাল থিয়েটারে 'বেণীসংহার' নাটকের মহালা চলিতেছিল। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ পরামর্শ করিয়া বিনোদিনীকে সেই নাটকে একটী সামান্য ভূমিকা প্রদান করিলেন। সেটী দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকা। এই ক্ষুদ্র ভূমিকা লইয়াই বিনোদিনীর রঙ্গালয়ে প্রথম প্রবেশ। যদিও এই ভূমিকাটী নিতান্তই ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এই ক্ষুদ্র ভূমিকাটিও

বিনোদিনী এত সুন্দর রূপ অভিনয় করিয়াছিল, যে তাহাতেই থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বুঝিলেন, এই মেয়েটীর ভিতরে বেশ সার আছে। ইহাকে শিখাইয়া গড়িয়া লইতে পারিলে কালে একজন অভিনেত্রী হইতে পারিবে। বিনোদিনী প্রথম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া এই ভূমিকাটি এত সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করিয়াছিল, যে দর্শকগণ সমস্বরে সকলে মিলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া করতালি দিয়া উঠিয়াছিলেন। যাহার হয় তাহার এইরূপ প্রথম হইতেই হয়,—আর যাহার হয় না তাহার কোন দিনই হয় না, যেমন সুগায়ক সকলেই হইতে পারে না, ঈশ্বরদত্ত মধুর কণ্ঠস্বর থাকা প্রয়োজন। বিনোদিনীর এই অল্প বয়সে অত সুন্দর অভিনয় কেবল শিক্ষার গুণে কিছুতেই হয় নাই, নিশ্চয়ই তাহার ভিতরে ঈশ্বর দত্ত শক্তি ছিল। বেণীসংহারে সে অতি ক্ষুদ্র সখীর পাঠ অভিনয় করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর হইতেই সে বড় বড় ভূমিকা অভিনয় করিতে আরম্ভ করে এবং সেই সকল ভূমিকা সে কত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল এবং উহাতে যে কি উচ্চ সম্মান ও যশের অধিকারিণী হইয়াছিল, এইবার আমরা তাহাই ক্রমে ক্রমে বলিব। বিনোদিনী থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া প্রথম বেণীসংহারের ভূমিকাটি পাইয়া কিরূপ অভিনয় করিয়াছিল সে বিষয় সে নিজে যাহা লিখিয়াছে, পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বিনোদিনী লিখিতেছে,—

"আমি যখন প্রথম থিয়েটারে যাই, তখন রসিক নিয়োগীর গঙ্গার ঘাটের উপর যে বাড়ী ছিল, তাহাতে থিয়েটারের রিহার্সল হইত। সে স্থান যদিও আমার বিশেষ স্মরণ নাই, তবুও অল্প অল্প মনে পড়ে। বড়ই রমণীয় স্থান ছিল, একেবারে গঙ্গার উপরে বাড়ী ও বারেন্দা, নীচে গঙ্গার বড় বাঁধান ঘাট; দুই ধারে অন্তিম পথ যাত্রীদিগের বিশ্রাম ঘর। সেই

বালিকাকালের সেই রমণীয় ছবি সুদূর স্মৃতির ন্যায় এখন আমার মনোমধ্যে জাগিয়া আছে। আহা গঙ্গা কেমন কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইত! আমি সেই টানা বারান্দায় ছুটছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম। আমার মনে কত আনন্দ, কত সুখস্বপ্ন ফুটিয়া উঠিত! বালিকা বলিয়াই হউক অথবা শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়াই হউক, সকলে আমাকে বিশেষ স্নেহ ও যত্ন করিতেন। আমরা যে তখন বিশেষ গরীব ছিলাম তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ নিজের একখানি বসতি বাটী ছাড়া ভাল কাপড় জামা বা অন্য দ্রব্যাদি আমাদের কিছুই ছিল না। সেই সময় রাজা বলিয়া যে প্রধানা অভিনেত্রী ছিলেন, তিনি আমায় ছোট হাতকাটা দুটী ছিটের জামা তৈয়ারী করাইয়া দেন। তাহা পাইয়া আমার যে কত আনন্দ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। সেই জামা দুইটীই আমার শীতের সম্বল ছিল।

" * * * সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় বেণীসংহারের একটী ছোট পার্ট দিলেন, সেটী দ্রৌপদীর একটী সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা। তখন বই প্রস্তুত হইলে নাট্যমন্দিরে গিয়া ড্রেস রিহার্সল দিতে হইত। যে দিন উক্ত বইয়ের ড্রেস রিহার্সল হয়, সে দিন আমার তত ভয় হয় নাই, কেন না রিহার্সলে বাড়ীতেও যাঁহারা দেখিতেন, সেখানেও প্রায় তাঁহারাই সকলে এবং দুই চারিজন অন্য লোক থাকিতেন।

"কিন্তু যে দিন পার্ট লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে ষ্টেজে বাহির হইতে হইল, সে দিনের হৃদয়ভাব ও মনের ব্যাকুলতা কেমন করিয়া বলিব! সেই সকল উজ্জ্বল আলোকমালা, সহস্র সহস্র লোকের উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি, এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর দুরু দুরু করিতে লাগিল। পা দুটীও থর থর করিয়া কাঁপিয়া

উঠিল, আর চক্ষের উপর সেই সকল উজ্জ্বল দৃশ্য যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভিতর হইতে অধ্যক্ষেরা আমায় আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ভয়, ভাবনা ও মনের চঞ্চলতার সহিত কেবল একটা কিসের অব্যক্ত আগ্রহ যেন মনের মধ্যে উথলিয়া উঠিতে লাগিল,—তাহা কেমন করিয়া বলিব! একে আমি অতিশয় বালিকা, তাহাতে গরীবের কন্যা, কখনও এরূপ সমারোহপূর্ণ স্থানে যাইতে বা কার্য্য করিতে পাই নাই। বাল্যকালে শতবার মাতার নিকটে শুনিতাম, ভয় পাইলে হরিকে ভাবিও। আমিও ভয়ে ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, যে কয়েকটী কথা বলিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম, প্রাণপণ যত্নে তাঁহাদের শিক্ষানুযায়ী সুচারুরূপে ও সেইরূপ ভাব ভঙ্গীর সহিত বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় সমস্ত দর্শক আনন্দধ্বনি করিয়া করতালি দিতে লাগিলেন। ভয়েই হউক, আর উত্তেজনাতেই হউক আমার তখন গা কাঁপিতেছিল। ভিতরে আসিবামাত্র অধ্যক্ষেরা কত আদর করিলেন। কিন্তু তখন করতালির কি মর্ম্ম তাহা জানিতাম না। পরে সকলে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে কার্য্যে সফলতা লাভ করিলে সকলে আনন্দে করতালি দিয়া থাকেন।"

বেণী সংহারের কিছুদিন অভিনয় চলিবার পর ন্যাশানাল থিয়েটারে শ্রীযুক্ত হরলাল রায়ের "হেমলতা" নাটকের মহাসমারোহে অভিনয় হয়। এই নাটকে বিনোদিনীকে হেমলতার ভূমিকা প্রদান করা হয়। দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকার পর একেবারে এতবড় একটা নায়িকার ভূমিকা আজ অবধি কোন অভিনেত্রীই পায় নাই। থিয়েটারের অধ্যক্ষগণ বিনোদিনীকে হেমলতা নাটকে হেমলতার ভূমিকা প্রদান করিয়া যাহাতে সে সেই ভূমিকাটি সুচারু-রূপে অভিনয় করিতে পারে তদনুযায়ী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই

বলিয়াছি বিনোদিনীর শিক্ষা গ্রহণের যত্নের অভাব ছিল না। তাহার শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া থিয়েটারে সকলেই বলিতে লাগিলেন,—"না, মেয়েটা পার্টটা নেহাৎ মন্দ কর্ব্বে না।"

যথা সময়ে হেমলতা মহাসমারোহে ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত হইল। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ও অন্যান্য সকলে যাহা ভাবিয়া ছিলেন কার্য্যেও তাহাই হইল। বিনোদিনী হেমলতার ভূমিকাটি এত সুন্দর অভিনয় করিল যে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকেও সে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। তাঁহারা একবারও আশা করিতে পারেন নাই, যে এই ক্ষুদ্র বালিকার দ্বারা এত বড় উচ্চ অঙ্গের অভিনয় কিছুতে সম্ভব। বিনোদিনী এই হেমলতার ভূমিকা লইয়া ষ্টেজে অবতীর্ণ হইয়া অভিনয়ে যাহা ফুটাইয়া তুলিল তাহা গ্রন্থকার কখন কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। বিনোদিনী এই এক অভিনয়েই সকলকে দেখাইল যে সে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছে। হেমলতা নাটকে হেমলতার ভূমিকা গ্রহণ সম্বন্ধে বিনোদিনী লিখিয়াছে,—

"ইহার কিছুদিন পরেই সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় শ্রীযুক্ত হরলাল রায়ের হেমলতা নাটকে হেমলতার ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমার পার্ট শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া সকলে বলিতেন যে এই মেয়েটি হেমলতার পার্ট ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারিবে। এই সময় আর একজন অভিনেত্রী আসিলেন ও সেই সঙ্গে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মন্ অপেরা মাষ্টার হইয়া থিয়েটারে যোগ দিলেন। উক্ত অভিনেত্রীর নাম কাদম্বিনী দাসী। বহুদিন যাবৎ বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কাদম্বিনী অভিনয় কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অবসরপ্রাপ্তা। এই হেমলতার অভিনয় শিক্ষা-

লাভের সময় আমার হৃদয় যেন উৎসাহ ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। আমি কার্য্যস্থান হইতে বাড়ীতে আসিলেও, সেই সকল ভাব আমার মনে আঁকা থাকিত। তাঁহারা যেমন করিয়া বলিয়া দিতেন, যেমন করিয়া ভাবভঙ্গী সকল দেখাইয়া দিতেন, সেই সকল যেন আমার খেলার সঙ্গিনীদের ন্যায় চারি দিকে ঘিরিয়া থাকিত। আমি যখন বাড়ীতে খেলা করিতাম, তখনও যেন একটা অব্যক্ত শক্তির প্রভাবে তাহাতেই আচ্ছন্ন থাকিতাম। বাড়ী থাকিতে মন সরিত না, কখন আবার গাড়ী আসিবে, কখন আবার লইয়া যাইবে, তেমনি করিয়া নূতন নূতন সকল শিখিব, এই সকল সর্ব্বদাই মনে হইত। যদিও তখন আমি ছোট ছিলাম, তবুও মনের ভিতর কেমন একটা উৎসাহপূর্ণ মধুর ভাব ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহার পর যখন আমার শিক্ষা শেষ হইয়া অভিনয়ের দিন আসিল, তখন আর প্রথম বারের মত ভয় হইল না বটে. কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। সে দিন আমি রাজকন্যার ভূমিকা অভিনয় করিব কিনা—তকৃতকে ঝকৃঝকে উজ্জ্বল পোষাক দেখিয়া ভারি আমোদ হইল। তেমন পোষাক, পরা দূরে থাকুক, কখনও চক্ষেও দেখি নাই। যাহা হউক ঈশ্বরের অসীম দয়ায় আমি হেমলতার পার্ট সুচারুরূপে অভিনয় করিলাম। তখন হইতে লোকে বলিত যে, ইহার উপর ঈশ্বরের দয়া আছে। আর আমার এখন বেশ মনে হয়, যে আমার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বালিকা ঈশ্বর অনুগ্রহ ব্যতীত কেমন করিয়া সেরূপ দুরূহ কার্য্য সমাপন করিয়াছিল, কেন না আমার কোন গুণ ছিল না,—তখন ভালো লেখা পড়াও জানিতাম না, গানও ভাল জানিতাম না, তবে শিখিবার বড়ই আগ্রহ ছিল।'

"সেই সময় হইতে আমি প্রায়ই প্রধান প্রধান পার্ট অভিনয় করিতে বাধ্য

হইতাম। আমার অগ্রবর্ত্তী অভিনেত্রীগণ যদিও আমার অপেক্ষা অধিকবয়স্কা ছিলেন, তথাপি আমি অল্প দিনের কাজেই তাহাদের সমান হইয়াছিলাম।”

থিয়েটারে প্রবেশ করিবার পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিনোদিনীর প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল। অতি অল্প বয়সে এত সুন্দর অভিনয় বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আজিপর্য্যন্ত কোন অভিনেত্রী করিতে পারে নাই। আমাদের দেশে যে সকল অভিনেত্রী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহাদের প্রথম বয়সে রঙ্গ-মঞ্চে প্রবেশ করিয়া অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্টের অভিনয় করিতে হইয়াছে, অনেক বসা মাজার পর তাহারা তবে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিনোদিনী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াই কেবলমাত্র একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা অভিনয় করিবার পরই নাটকের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা পাইয়াছে, এবং সে ভূমিকা অতি সুচারুরূপে অভিনয় করিয়াছে। কিন্তু এই সকল বড় বড় ভূমিকা বিনোদিনীর দ্বারা অভিনীত করাইতে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। বিনোদিনী তখন নিতান্ত বালিকা, কাজেই তাঁহাদের ছোক্‌রাদের বয়সীর ভূমিকা সাজাইবার যাত্রাওয়ালাদের প্রথা অবলম্বন করিতে হইত। ‘আমার কথার’ ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

“বিনোদিনী সত্য বলিয়াছে, সে সময় তাহাকে নায়িকা সাজাইতে সজ্জাকরণে যাত্রার দলের ছোক্‌রা সাজাইবার প্রথা অবলম্বন করিতে হইত। কিন্তু সে সময় তাহার শিক্ষা গ্রহণের ঔৎসুক্য ও তীব্র মেধা দেখিয়া ভবিষ্যতে যে বিনোদ রঙ্গমঞ্চে একজন প্রধান অভিনেত্রী হইবে তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছিল।”

আজি পর্য্যন্ত কোন অভিনেত্রী সাজাইতে এ প্রথা অবলম্বন করিতে হয় নাই। বালিকা বয়সে নাটকের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা অভিনয় বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এক বিনোদিনীই করিয়াছে।

তৃতীয় লহরী

অভিনেত্রীর যশঃ।

গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটার অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিতেছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ লাভবান্ হইতেছিলেন না। কলিকাতায় অভিনয় করিয়া তাঁহাদের যাহা আয় হইতেছিল তাহাতে একটা থিয়েটারের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছিল না। কাজেই তাঁহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহারা তাঁহাদের থিয়েটার লইয়া পশ্চিমাঞ্চলে অভিনয় করিতে যাইবেন। যেমন পরামর্শ অমনি কার্য্যারম্ভ। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা সদলবলে পশ্চিম অঞ্চলে থিয়েটার করিতে বাহির হইলেন। বিনোদিনীকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার কথা হইল, কিন্তু বিদেশে একলা যাইতে অস্বীকার পাওয়ায় তাহার পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া কোম্পানী তাহার মাতাকে তাঁহাদের সহিত লইলেন। গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটার পশ্চিমে মহাসুখ্যাতির সহিত নানা স্থানে অভিনয় করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। কিন্তু কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটার অধিক দিন জীবিত ছিল না। পাঁচ ছয় মাস কলিকাতায় অভিনয় করিবার পরই গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল।

পশ্চিমে গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটারের অভিনয় সম্বন্ধে বিনোদিনী 'আমার কথায়' যাহা লিখিয়াছে তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সে লিখিতেছে,—

"গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটার কোম্পানি পশ্চিম অঞ্চলে থিয়েটার করিতে বাহির হন, এবং আমার আর পাঁচ টাকা মহিনা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া আমাকে ও আমার মাতাকে সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহারা নানা দেশ ভ্রমণ করেন। * * * * * এক রাত্রি লক্ষ্ণৌ নগরে সত্রমণ্ডীতে আমাদের "নীল-দর্পণ" অভিনয় হইতেছিল, সেই দিন লক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় সকল সাহেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। যে সময়ে রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল, ঠিক সেই সময়ে তোরাব দরজা ভাঙ্গিয়া রোগ সাহেবকে দারুণ প্রহার করে ও নবীন মাধব ক্ষেত্রমণিকে লইয়া চলিয়া যায়। একেতো নীলদর্পণ নাটকের অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় হইতেছিল, তাহাতে বাবু মতিলাল সুর তোরাব, এবং অবিনাশ কর মহাশয় মিষ্টার রোগ সাহেবের অংশ অতিশয় দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া সাহেবেরা বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটা গোলযোগ হইয়া পড়িল এবং একজন দৌড়িয়া একেবারে ষ্টেজের উপর উঠিয়া তোরাবকে মারিতে উদ্যত। এই সব কারণে আমাদের কান্না, অধ্যক্ষদিগের ভয়, আর ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়ের কম্পন। তারপর অভিনয় বন্ধ করিয়া পোষাক আসবাব বাঁধিয়া ছাদিয়া বাসায় এক রকম পলায়ন। পর দিন প্রভাতেই লক্ষ্ণৌ নগর পরিত্যাগ করিয়া হাঁফ ছাড়ন।"

"* * * * আমি নানা রকম পার্ট অভিনয় করিয়াছিলাম, "সতী কি কলঙ্কিনীতে" রাধিকা, "নবীন তপস্বিনীতে" কামিনী, "সধবার একাদশীতে" কাঞ্চন, "বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে রতি—কত বলিব। তবে বলিয়া রাখি যে সে সময় আমার এত অল্প বয়স ছিল যে বেশ করিবার সময় বেশকারীদের বড় ঝঞ্ঝাটেই পড়িতে হইত। আমার মত একটী বালিকাকে কিশোরবয়স্কা বা

সময় সময় প্রায় পূর্ণযুবতীর বেশে সজ্জিত করিতে তাহারা বড়ই বিরক্ত হইতেন তাহা বুঝিতাম। আবার কখন কখন সকলে তামাসা করিয়া বলিতেন 'তোকে কামার দোকানে পাঠাইয়া দিয়া পিটিয়া একটু বড় করিয়া আনাইব।' নাটোরে যখন আমরা অভিনয় করি, তখন আমার সম্বন্ধে একটী 'অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সেখানে গোলাপসিংহ বলিয়া একজন বড় জমীদার মহাশয়ের খেয়াল উঠিল, যে তিনি আমায় বিবাহ করিবেন এবং যত টাকা লইয়া আমার মাতা সন্তুষ্ট হন তাহা দিবেন। পূর্ব্বোক্ত জমিদার মহাশয় অর্দ্ধেন্দু বাবু ও ধর্ম্মদাস বাবুকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তখন উহারা বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। তিনি নাকি সেখানকার একটী বিশেষ বড় লোক। একে বিদেশ, উপরন্তু এই সকল কথা শুনিয়া আমার মা তো কাঁদিয়াই আকুল, আমিও ভয়ে একেবারে কাঁটা। এই উপলক্ষে আমাদের শীঘ্রই নাটোর ছাড়িতে হয়। ফিরিবার সময় আমরা ৺শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধাম দিয়া আসিয়াছিলাম। ৺শ্রীবৃন্দাবন ধামে আবার আমি একটী বিশেষ ছেলেমানুষী করিয়াছিলাম। তাহা এই :--থিয়েটার কোম্পানী সেই দিন ৺শ্রীধামে পৌছিয়া চল্লিশজন লোকের জলখাবার ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া তাঁহারা ৺শ্রীজীউদিগের দর্শন করিতে গেলেন এবং আমাকে বলিয়া গেলেন যে "তুমি ছেলে মানুষ, এখনই সবে গাড়ীতে আসিলে, এখন জল খাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া থাক, আমরা দেবতা দর্শন করিয়া আসি।" আমি আমার দরজা বন্ধ করিয়া রহিলাম। তাঁহারা সকলে ৺শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর দর্শনের জন্য চলিয়া গেলেন। আমার একটু রাগ ও দুঃখ হইল বটে, কিন্তু কি করিব। মনের ক্ষোভ মনেই চাপিয়া রাখিলাম। ঘরের দরজা দিয়া বসিয়া আছি, এমন

সময় একটা বানর আসিয়া দরজার কাট ধরিয়া বসিল। আমি বালিকা-সুলভ-চপলতা-বশতঃ তাহাকে একটী গুজিয়া খাইতে দিলাম। সে খাইতেছে, সেই সময় আর দুইটী আসিল, আমি তাহাদেরও কিছু খাবার দিলাম। আবার গোটা দুই আসিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম যে ইহাদেব কিছু কিছু খাবার দিলে সকলে চলিয়া যাইবে। সেই ঘরেব চার পাঁচটী জানালা ছিল, আমি যত আহার দিই ততই জানালার কাছে বারান্দায় বাঁদরে বাঁদরে ভরিয়া যাইতে লাগিল। তখন আমার বড় ভয় হইল, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে যত খাবার ছিল প্রায় তার সকলই তাহাদের দিতে লাগিলাম, আর মনে করিতে লাগিলাম যে এইবারই তাহারা চলিয়া যাইবে। কিন্তু যত খাবার পাইতে লাগিল বাঁদরের দল তত বাড়িতে লাগিল, আর আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের ক্রমাগত আহার দিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কোম্পানির লোক ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—ছাদ, বারান্দা, জানালা সব বানরে ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহারা লাঠি ইত্যাদি লইয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিয়া আমায় দরজা খুলিতে বলিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে দরজা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সকল কথা তাহাদের বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া আমার মা আমায় দুইটী চড় মারিলেন ও কত বকিতে লাগিলেন। আমি কত ক্ষতি করিয়াছিলাম, কিন্তু কোম্পানির সকলে হাসিয়া মাকে মারিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "মারিও না—ছেলে মানুষ ও কি জানে? আমাদের দোষ, সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেই হইত। অর্দ্ধেন্দু বাবু বলিলেন, বোকা মেয়ে আমাদের সকল খাবার বিলাইয়া ব্রজবাসীদিগের ভোজন করাইলি, এখন আমরা

কি খাই বল দেখি?" আবার জলখাবার খরিদ করিয়া আনা হইল, তবে তাঁহারা সব খাইলেন।"

* * * ইহার পর আমরা কলিকাতায় চলিয়া আসি। তারপর বোধ হয় প্রায় ছয় মাস পরে "গ্রেট্ ন্যাশানাল" থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে আমি মাননীয় ৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম ২৫৲ পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। তখনও যদিও আমি বালিকা, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কার্য্যতৎপরা এবং চালাক চট্পটে হইয়াছিলাম। স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি চির ঋণে আবদ্ধ। এইস্থান হইতেই আমার অভিনয় কার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতির প্রথম সোপান। সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাননীয় স্বর্গগত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অতুলনীয় স্নেহ মমতা। তিনি আমায় এত অধিক স্নেহ করিতেন—বোধ হয় তাঁহার নিজের কন্যা থাকিলেও এর অধিক স্নেহ পাইত না।"

বিনোদিনী থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া বালিকা বয়সে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে যে কয়টী ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে তাহার "আমার কথা" ও অন্যান্য সূত্র হইতে যাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহার কতকটা আভাস আমরা প্রদান করিয়াছি।

এইবার আমরা তাহার কৈশোরের কথা যাহা জানিয়াছি তাহার কতকটা আভাস প্রদান করিবার চেষ্টা করিব। একটী বৃক্ষে শত সহস্র ফুল ফুটিয়া উঠে, কিন্তু সব কয়টী ফুলেই ফল ধরে না। কতক ঝরিয়া যায়, কতক শুকাইয়া যায়, আবার কতক ফল ধরিবার পূর্ব্বেই কীটদষ্ট হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শত সহস্র ফুল প্রতি দিন ফুটিয়াছে—এখনও ফুটিতেছে, কিন্তু তাহার কয়টীতে ফল ধরিতেছে?

এমন অনেক ফুল আছে যাহার ফল উৎপাদনের শক্তিই নাই,—আবার এমন অনেক ফুল আছে যাহারা শক্তি থাকিতেও নানা কারণে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বিনোদিনী-ফুল রঙ্গমঞ্চে ফুটিয়া যশের সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়া এমন একটী চিরস্থায়ী ফল প্রদান করিয়া গিয়াছে যে সেই ফলের আস্বাদ আজিও বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, নাট্যামোদী প্রত্যেক ব্যক্তিই, ভোগ করিতেছেন। অতি দরিদ্র বিনোদিনী, অতি কুৎসিত স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াও নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে কেমন করিয়া ধনে ও যশে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহা সকলেরই জানা উচিত। তাহা ছাড়া যাহারা বিনোদিনীর ন্যায় কর্ম্মফলে হীন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের তাহার জীবনী সর্ব্বাগ্রে পাঠ করা উচিত। এই সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"যাহারা বিনোদিনীর ন্যায় অভাগিনী, কুৎসিত পন্থা ভিন্ন যাহাদের জীবনোপায় নাই, মধুর বাক্যে যাহাদিগকে ব্যভিচারীরা প্রতিদিন প্রলোভিত করিতেছে, তাহারাও মনে মনে আশ্বাসিত হইবে যে যদি বিনোদিনীর মত কায়মনে রঙ্গালয়কে আশ্রয় করে, তাহা হইলে এই ঘৃণিত জন্ম জনসমাজের কার্য্যে অতিবাহিত করিতে পারিবে। যাহারা অভিনেত্রী, তাহারা বুঝিবে কিরূপে মনোনিবেশের সহিত নিজ ভূমিকার প্রতি যত্ন করিলে জনসমাজে প্রশংসা ভাজন হইতে পারে।"

কাজেই আমাদের মনে হয় এই ঘটনাবহুল জীবনী সকলেরই পাঠ করা উচিত।

চতুর্থ লহরী।

নব জীবনের সুখ ও দুঃখ

কৈশোরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীর নাম যখন একজন সুদক্ষ অভিনেত্রী বলিয়া দশের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল সেই সময় বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিনোদিনীকে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন দিয়া নিজের থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। যদিও বেঙ্গল থিয়েটারে তখন সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী বনবিহারিণী (ভূনী), সুকুমারী দত্ত (গোলাপী) ও এলোকেশী প্রভৃতি ছিল তথাপি বিনোদিনী ঈশ্বর দত্ত শক্তির বলে ও নিজের প্রাণপণ যত্নে অধিকাংশ নাটকেরই প্রধান প্রধান ভূমিকা পাইতে আরম্ভ করিল। এই থিয়েটার হইতেই বিনোদিনীর উন্নতির সোপান।

বিনোদিনী তাহার 'আমার কথায়' লিখিয়াছে যে সে যখন বেঙ্গল থিয়েটারে প্রবেশ করে, তখন বেঙ্গল থিয়েটারে মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয়ার্থে উহার মহালা চলিতেছিল এবং এই নাটকে সে চিত্রাঙ্গদা, প্রমিলা, বারুণী, রতি, মায়া, মহামায়া ও সীতা এই সাতটী ভূমিকার একই রাত্রে অভিনয় করিয়াছিল। বিনোদিনী মেঘনাদবধে সাতটী ভূমিকা একই রাত্রে অভিনয় করিয়াছিল এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু তাহা বেঙ্গল থিয়েটারে নহে। বহু দিনের কথা, তাই বিনোদিনী কোন

থিয়েটারে সে সাতটী ভূমিকা এক রাত্রে অভিনয় করিয়াছিল তাহার বিষয়ে গোল করিয়া ফেলিয়াছে। এ সম্বন্ধে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র লিখিতেছেন,—

"বিনোদিনীর স্মরণ নাই, মেঘনাদের সাতটী ভূমিকা বিনোদিনীকে অভিনয় করিতে হয়, কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারে নয়। যাহা হউক সাতটী ভূমিকাই অতি সুন্দর হইয়াছিল। সাতটী ভূমিকা একজনের দ্বারা অভিনীত হওয়া কঠিন। দুইটী বৈষম্যপূর্ণ ভূমিকা এক নাটকে অভিনয় করা সাধারণ অভিনয়শক্তির বিকাশ নহে।"

বেঙ্গল থিয়েটারে বিনোদিনী বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনীতে মনোরমার ভূমিকা অভিনয় করিত। বিনোদিনীর অভিনয় এই ভূমিকার এরূপ চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না। তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জীবনে কখনও ভুলিবেন না। বিনোদিনীর পর অনেক বড় বড় অভিনেত্রী এই ভূমিকাটি অভিনয় করিয়াছে বটে, কিন্তু তেমনটী আজ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য নিম্নে আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি লিখিতেছেন,—

"মৃণালিনীতে আমি 'পশুপতি' সাজিতাম, বিনোদ 'মনোরমা' সাজিত। অন্যান্য অনেক নাটকেই আমরা নায়ক নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছি, সমস্ত বলিতে গেলে প্রবন্ধ অনেক দীর্ঘ হয়। কেবল 'মনোরমার' কথাই বলিব। মনোরমার কথা বলিতেছি তাহার কারণ, আমি বিনোদের প্রতি অভিনয়েই সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমবাবু বর্ণিত সেই বালিকা ও গম্ভীরা মুর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি—এই স্থিরগম্ভীরা তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণী, আবার পরক্ষণেই "পশুপতি, তুমি কাঁদছ কেন?" বলিয়াই প্রেমবিহ্বলা বালিকা! হেমচন্দ্রের সহিত

কথোপকথন করিতে করিতে এই স্নেহশীলা ভগিনী, ভ্রাতার মনোবেদনায় সহানুভূতি করিতেছে, আর পরক্ষণেই "পুকুরে হাঁস দেখিতে যাওয়ার" অসাধারণ অভিনয়চাতুর্য্য প্রদর্শন! বেঙ্গল থিয়েটারে আসিয়া বঙ্কিম বাবু কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না, কিন্তু যিনি মনোরমার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহাকেই বলিতে হইয়াছে যে এ প্রকৃতই 'মৃণালিনীর' মনোরমা। তাহার বালিকাভাব দেখিয়া এক ব্যক্তির মনে উদয় হইয়াছিল বুঝি কোন বালিকা অভিনয় করিতেছে। অভিনয়কৌশলে বিনোদিনীর এই উভয় ভাবের পরিবর্ত্তন, উচ্চ শ্রেণীর অভিনেত্রীরও উচ্চ প্রশংসা। বিনোদিনী একবাক্যে দর্শকের নিকট সেই উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। * * * চরমোৎকর্ষ লাভ সহজে হয় না। প্রথমে নিজ ভূমিকা তন্ন তন্ন করিয়া পাঠের পর সেই ভূমিকার কিরূপ অবয়ব হওয়া উচিত, তাহা কল্পনা করিতে হয়। অঙ্গে কি কি পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তনে সেই ভূমিকায় কল্পিত আকার গঠিত হইবে, পটে চিত্রকরের ন্যায় মনে মনে সেই আভাস আনিবার প্রয়োজন। অভিনয়কালীন ঘাতপ্রতিঘাতে কিরূপ অঙ্গভঙ্গী হইবে এবং সেই সকল ভঙ্গী সুসঙ্গত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিবে, তাহার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হয়। অভিনয় কালে কি আপনার কথা কহিতে, কি সহযোগী অভিনেতার কথা শুনিতে, যে স্থানে মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিবে, সেইখানেই অভিনয়ের রসভঙ্গ হইবে।"

বেঙ্গল থিয়েটারেই সর্ব্ব প্রথম বঙ্কিম বাবুর মৃণালিনীর অভিনয় হয়। সে সময় যেরূপ মৃণালিনীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হইয়াছিল তেমন অভিনয় তাহার পর আর কখনও হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম মৃণালিনীর অভিনয় রজনীতে কে কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছিল পাঠক

পাঠিকার অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম। হেমচন্দ্রের ভূমিকা হরি বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়াছিল, পশুপতির ভূমিকা কিরণ বাঁড়ুয্যে লইয়াছিল, গিরিজায়া শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত (গোলাপ) সাজিয়াছিল, মৃণালিনীর অংশ ভূনী লইয়াছিল, আর বিনোদিনী মনোরমা সাজিয়াছিল। এমন মনোরমা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আর হয় নাই, আর হইবে বলিয়াও সম্ভাবনা নাই।

বেঙ্গল থিয়েটারে বিনোদিনী দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা সাজিত, আর প্রয়োজন হইলে কখন কখন তিলোত্তমার ভূমিকা গ্রহণ করিত। এমন অনেক দিন হইয়াছে যে এক রাত্রেই ঐ দুইটী ভূমিকারই তাহাকে অভিনয় করিতে হইয়াছে। তাহার ভিতর আবার একদিন আসমানীর অংশও তাহাকে অভিনয় করিতে হইয়াছে। তবে ভগবানের তাহার উপর এইটুকু করুণা ছিল যে সে যখনই যে ভূমিকাটিতে অবতীর্ণা হইত সেই ভূমিকাটি নিতান্ত মন্দ কেহই বলিতে পারিতেন না। দুর্গেশনন্দিনী অভিনয় সম্বন্ধে বিনোদিনী তাহার 'আমার কথায়' লিখিয়াছে,—

"দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা ও তিলোত্তমা এই দুইটী ভূমিকা, প্রয়োজন হইলে দুইটীই এক রাত্রিতে এক সঙ্গে, অভিনয় করিয়াছি। কারাগারের ভিতর ব্যতীত আয়েষা ও তিলোত্তমার দেখা নাই। কারাগারে তিলোত্তমার কথাও ছিল না, অন্য একজন তিলোত্তমার কাপড় পরিয়া কারাগারে গিয়া, "কে'ও বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা" জগৎ সিংহের মুখে এই মাত্র কথা শুনিয়া, মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িত। আর সেই সময় আয়েষার ভূমিকার শ্রেষ্ঠ অংশ—এই ওসমানের সহিত অতিলজ্জায় অতিসঙ্কুচিতা ভীরু রাজকন্যা তিলোত্তমা, তখনই আবার উন্নত-হৃদয়া গর্ব্বিণী অপরিসীম হৃদয়-বলশালিনী প্রেমপরিপূর্ণা নবাব পুত্রী আয়েষা! এইরূপ দুই ভাবে নিজেকে বিভক্ত

করিতে কত যে উদ্যমের প্রয়োজন হইত তাহা লিখিবার নহে। ইহা যে প্রত্যহ ঘটিত তাহা নহে কার্য্যকালীন আকস্মিক অভাবে এইরূপে কয়েকবার অভিনয় করিতে হইয়াছিল।”

“এক দিন অভিনয় রাত্রে আয়েষা সাজিবার জন্য গৃহ হইতে সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া অভিনয় স্থানে আসিয়া দেখিলাম যে যিনি আসমানীর ভূমিকা অভিনয় করিবেন তিনি উপস্থিত নাই,—রঙ্গালয় জনপূর্ণ। কর্ত্তৃপক্ষগণের ভিতর চুপি চুপি কথা হইতেছে যে বিনোদকে আসমানীর পার্ট অভিনয় করিতে বলিবে। উপস্থিত বিনোদ ব্যতীত আর কেহই পারিবে না। আমি বাটী হইতে একেবারে আয়েষার পোষাকে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছি বলিয়া ভরসা করিয়া কেহই বলিতেছেন না। এমন সময় বাবু অমৃতলাল বসু আসিয়া অতি আদর করিয়া বলিলেন, “বিনোদ, লক্ষ্মী ভগিনীটী আমার, আসমানী যে সাজিবে তাহার অসুখ করিয়াছে। তোমায় আজ চালাইয়া দিতে হইবে। নতুবা বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি।” যদিও অনেকবার হবে না, পারিব না বলিয়াছিলাম বটে,—আবার বাস্তবিক সেই নবাব পুত্রীর সাজ ছাড়িয়া তখন দাসীর পোষাক পরিতে হইবে, আবার আয়েষা সাজিতে অনেক খুত হইবে বলিয়া মনে মনে বড় রাগ হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের কার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় করিবার সময় ইংলিশম্যান ষ্টেটসম্যান ইত্যাদি কাগজে আমায় কেহ, “সাইনোরা” কেহ কেহ বা “ফ্লাওয়ার অব্ দি নেটিভ ষ্টেজ” বলিয়া উল্লেখ করিতেন।”

বেঙ্গল থিয়েটারে অবস্থানকালে বাহিরে অভিনয় করিতে যাইয়া যে কয়েকটী বিপদ বিনোদিনীর মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, সেই ঘটনা কয়টী

বিনোদিনী তাহার "আমার কথায়" অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছে। আমাদের পাঠক পাঠিকার কৌতূহল নিবারণের জন্য নিম্নে 'আমার কথায়' বিনোদিনী যাহা লিখিয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। বিনোদিনী লিখিয়াছে,—

"একবার আমরা চুয়াডাঙ্গায় সদলবলে যাই। আমাদের জন্য একখানি গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সকলে একত্রে যাইতেছি। মনে স্মরণ নাই, মাঝখানে কোন ষ্টেসনে তাহাও মনে নাই, তবে সে যে একটী বড় ষ্টেসন সন্দেহ নাই। সেই স্থানে নামিয়া উমিচাঁদ বলিয়া ছোট বাবু মহাশয়ের একজন আত্মীয় (আমরা মাননীয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ছোট বাবু বলিয়া জানিতাম) ও আর দুই চারিজন এক্টার আমাদের কোম্পানির জন্য খাবার আনিতে গেলেন। জলখাবার ইত্যাদি লইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু উমিচাঁদ বাবুর আসিতে দেরী হইতে লাগিল। এমন সময় গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, ছোট বাবু মহাশয় গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া, "ওহে উমিচাঁদ, শীঘ্র এস,—শীঘ্র এস, গাড়ী যে ছাড়িল" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। গাড়ীও একটু একটু চলিতে লাগিল। ইত্যবসরে উমিচাঁদবাবু দৌড়িয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীও জোরে চলিল। তখন উমিচাঁদবাবু অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ছোট বাবু মহাশয় ও অন্যান্য সকলে "সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়াছে, জল দাও জল দাও" করিতে লাগিলেন। চারুচন্দ্র বাবু ব্যস্ত হইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন দুর্দৈব যে সমস্ত গাড়ীখানার ভিতর একটী লোকের কাছে এমন এক গণ্ডূষ জল ছিল না যে সেই আসন্ন-মৃত্যু লোকটীর তৃষ্ণার জন্য তাহা দেয়। ভুনী তখন সবে মাত্র বেঙ্গল থিয়েটারে কার্য্যে

নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার কোলে ছোট মেয়ে, সে আর অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া আপনার স্তন দুগ্ধ ঝিনুকে করিয়া উমিচাঁদবাবুর মুখে দিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। বোধ হয় দশ পনের মিনিটের মধ্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটিল। গাড়ীশুদ্ধ লোক একেবারে ভয়ে ভাবনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ছোট বাবু মহাশয় উমিচাঁদবাবুর মুখে মুখ রাখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি একে বালিকা, তাহাতে ওরকম মৃত্যু কখনও দেখি নাই, ভয়ে মাতার কোলের উপর শুইয়া পড়িলাম। উমিচাঁদবাবুর মৃত্যুকালীন সেই মুখভঙ্গী আমার মানসক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া চারু বাবু মহাশয় ছোট বাবুকে বলিলেন, 'শরৎ, সহসা যা হইবার হইয়াছে, এখন যদি রেলের লোক এ ঘটনা শুনিতে পারে তাহা হইলে গাড়ী কাটিয়া দিবে। এত লোক জন লইয়া রাস্তার মাঝে আর এক বিপৎ ঘটিতে পারে।' ছোট বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি উমির মাকে গিয়া কি বলিব ? সে আমায় আসিবার কালে উমিচাঁদ সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়া দিয়াছিল।" উমিচাঁদ বাবু মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। এই রকম ভয়ানক বিপৎ ঘাড়ে করিয়া আমরা সন্ধ্যার সময় চুয়াডাঙ্গায় নামিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা, সেখানে ষ্টেসন মাষ্টারকে বলা হইল যে এই আগের ষ্টেসনে এই ঘটনা ঘটিয়াছে ! তারপর আমরা বাসায় গিয়া যে যেখানে পারিলাম অবসন্ন হইয়া সে রাত্রে শুইয়া পড়িলাম। ছোটবাবু ও দুই চারিজন অভিনেতা শব দাহ করিতে যাইলেন। সেখানে তিন দিন থাকিয়া অভিনয় কার্য্য সারিয়া সকলে অতি বিষণ্ণভাবে কলিকাতায় ফিরিলাম। এই শোকপূর্ণ ঘটনাটি কোন যোগ্য লেখকের দ্বারা বর্ণিত হইলে সে ভীষণ ছবি কতক পরিমাণে পরিস্ফুট হইত।"

"আর একবার বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত সাহেবগঞ্জ না কোথায় একটী জঙ্গলা দেশে যাইবার সময়ে একটী ঘোর বিপদে পড়ি। নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে কতকটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাতী ও গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। চারিটী হাতী ও কয়েকখানি গরুরগাড়ী আমাদের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। যাহারা যাহারা গরুরগাড়ীতে যাইবে, তাহারা তিনটার সময চলিয়া গেল। আমি ছেলে মানুষীর ঝোঁকে বলিলাম যে হাতীর উপর যাইব। ছোটবাবু মহাশয় কত বারণ করিলেন, কিন্তু আমি কখনও হাতী দেখি নাই, চড়াতো দূরের কথা। ভারি আমোদ হইল। আমি গোলাপকে বলিলাম, 'দিদি! আমি তোমার সঙ্গে হাতীতে যাব।' গোলাপ বলিল, 'আচ্ছা যাস্।' সে আমায় তার সঙ্গে রাখিল। মা কত বকিতে বকিতে আগে চলিয়া গেলেন। আমরা সন্ধ্যা হয় এমন সময় হাতীতে উঠিলাম। আমি গোলাপ ও আর তুইজন পুরুষ মানুষ একটাতে, আর চারিজন করিয়া আবার তিনটাতে। কিছু দূর গিয়া দেখি এমন রাস্তাতো কখন দেখি নাই। মোটে একহাত চওড়া রাস্তা আর তুই ধারে বুকপর্য্যন্ত বন, ধান গাছ কি অন্য গাছ বলিতে পারি না। আর বনে ক্রমেই যত রাত্রি হইতে লাগিল, ততই বৃষ্টি ব্যাপিয়া আসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আরম্ভ হইল। হাতী তো যায় যায় করিতে লাগিল। শেষে সকলকে বেত বনের মধ্যে লইয়া ফেলিল, আবার তাহার উপর শিলাবৃষ্টি। হাতীর উপর ছাউনী নাই। সেই বনে ঝড়, মেঘগর্জ্জন, তাহার উপর শিলাবর্ষণ। আমি কেঁদেই অস্থির। গোলাপও কাঁদিতে লাগিল। শেষে হাতী আর এগোয় না। শুঁড় মাথার উপর তুলিয়া আগের পা বাড়াইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার তখন মাহুত বলিল যে, বাঘ

বাহির হইয়াছে, তাই হাতী যাইতেছে না।” মাহুত চারিজন হৈ হৈ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল, আমি তো আড়ষ্ট। আমার হাতী চড়ার আনন্দ মাথায় উঠিল। ভয়ে কেঁদে কাঁপিতে লাগিলাম। পাছে হাতীর উপর হইতে পড়িয়া যাই বলিয়া একজন পুরুষ মানুষ আমায় ধরিয়া রহিল। তাহার পর কত কষ্টে প্রায় আধমরা হইয়া আমরা কোন রকমে বাসায় পৌছিলাম। জলে শীতে আমরা এমনি অসাড় হইয়া গিয়াছিলাম, যে হাতী হইতে নামিবারও ক্ষমতা ছিল না। ছোট বাবু নিজে ধরিয়া নামাইয়া দিয়া আগুণ করিয়া আমার সমস্ত গা সেঁকিতে লাগিলেন। মা তো বকিতে বকিতে কান্না জুড়িলেন। মায়ের বুলিই ছিল, হতচ্ছাড়া কোন কথা শোনে না। সে দিন আমাদের অভিনয়ের কথা ছিল, কিন্তু দুর্য্যোগের জন্য ও আমাদের শারীরিক অবস্থার জন্য সে দিন অভিনয় বন্ধ রহিল।

আর এক দিন নৌকাতে বিপদে পড়িয়াছিলাম। আর একবার পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া ঝড়ের মাঝে পড়িয়া পথ হারাইয়া পাহাড়ীদের কুটীরে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করি। সেই পাহাড়ী আবার রাস্তা দেখাইয়া দিয়া বাসায় রাখিয়া যায়।

একবার কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে ঘোড়ায় চড়িয়া অভিনয় করিতে করিতে পড়িয়া যাওয়ায় বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। প্রমিলার পার্ট ঘোটকের উপরে বসিয়া করিতে হইত। সেখানে মাটীর প্লাটফরম প্রস্তুত হইয়াছিল। যেমন আমি ষ্টেজ হইতে বাহিরে আসিব অমনি মাটীর ধাপ ভাঙ্গিয়া ঘোড়া হুমড়ী খাইয়া পড়িয়া গেল। আমিও ঘোড়ার উপর হইতে প্রায় দুই হাত দূরে পতিত হইয়া অতিশয় আঘাত পাইলাম। উঠিয়া দাঁড়াইবার

শক্তি রহিল না। তখনও আমার অভিনয়ের অনেক খানি বাকি আছে। কি হইবে! চারু বাবু আমায় ঔষধ সেবন করাইয়া বেশ করিয়া আমার হাঁটু হইতে পেট পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। ছোটবাবু মহাশয় কত স্নেহ করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীটী, আজিকার কাজটি কষ্ট করিয়া উদ্ধার করিয়া দাও।" তাঁহার সে স্নেহময় সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে আমার বেদনা অর্দ্ধেক দূর হইল। কোনরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পরদিন কলিকাতা ফিরিলাম। ইহার পর আমি এক মাস শয্যাশায়িনী ছিলাম। যাহা হউক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়কালে আমি একরূপ সন্তোষে কাটাইয়াছিলাম, কেন না তখন বেশী উচ্চ আশা হয় নাই, যাহা পাইতাম তাহাতেই সুখী হইতাম। যেটুকু উন্নতি করিতে পারিতাম সেইটুকুই যথেষ্ট মনে করিতাম। বেশী আশাও ছিল না, অতৃপ্তিও ছিল না। সকলেই বড় ভালবাসিতেন। হেসে খেলে নেচে কুঁদে দিন কাটাইতাম।"

এই সময় ৺কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় ৺গিরিশচন্দ্রকে লইয়া ন্যাসানাল থিয়েটার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগী হন। তখন তিনি প্রায়ই গিরিশচন্দ্রের সহিত বেঙ্গল থিয়েটার দেখিতে যাইতেন। তিনি বিনোদিনীর কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই মেয়েটী যেন প্রকৃত কপালকুণ্ডলা, ইহার অভিনয়ে বন্য সরলতা যেন একেবারে সজীব হইয়া উঠে।"

বিনোদিনীর কপালকুণ্ডলার অভিনয় সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,— "এক্ষণে যাঁহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখিতে যান, তাঁহাদের ধারণা যে মতি বিবির অংশই নায়িকার অংশ। কিন্তু যাঁহারা বিনোদিনীর অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিশ্চয়ই ধারণা যে কপালকুণ্ডলার নায়িকা কপাল-

কুণ্ডলা, মতিবিবি নয়। কপালকুণ্ডলার চরিত্র এই যে, বাল্যাবধি স্নেহপালিত না হওয়ায়, নবকুমারের বহু যত্নেও হৃদয়ে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় নাই। অবশ্য অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় সে গৃহকার্য্য করিত, কিন্তু যখন সে তাহার ননদিনীর স্বামী বশ করিবার ঔষধের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিল, তখন পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী হইয়া যায়। কিন্তু গৃহবদ্ধা কপালকুণ্ডলার অংশ অভিনয়কারিণী বিনোদিনী বনপ্রবেশমাত্রেই পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হইয়া বন্য-কপালকুণ্ডলা হইয়া যাইল। এই পরিবর্ত্তন বিনোদিনীর অভিনয়ে অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইত। তখন কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে কপালকুণ্ডলাই নায়িকা ছিল।"

যাহা হউক কেদার বাবু অতিশীঘ্রই গিরিশচন্দ্রকে লইয়া মহাসমারোহে ন্যাসানাল থিয়েটারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। গিরিশবাবু বিনোদিনীকে বেঙ্গল থিয়েটার হইতে তাঁহার থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। এই সম্বন্ধে বিনোদিনী 'আমার কথায়' লিখিয়াছে,—"পরে শুনিয়াছিলাম এই সময়ে গিরিশবাবু ছোটবাবুকে বলেন, 'আমরা একটী থিয়েটার করিব মনে করিতেছি। আপনি যদি বিনোদকে আমাদের থিয়েটারে দেন তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়।' ছোটবাবু মহাশয় অতি উচ্চহৃদয়সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'বিনোদকে আমি বড়ই স্নেহ করি; উহাকে ছাড়িতে হইলে আমার বড়ই ক্ষতি হইবে। তথাপি আপনার অনুরোধ আমি এড়াইতে পারি না। বিনোদকে আপনি লউন।'

"তারপর ছোটবাবু মহাশয় একদিন আমায় বলিলেন 'কিরে বিনোদ এখান হইতে যাইলে তোর মন কেমন করিবে না?' আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ বিষয় লইয়া সেদিন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও বলিলেন, 'ওসব কথা আমারও বেশ মনে আছে। তোমাকে

বেঙ্গল থিয়েটার হইতে আনিবার পরও শরৎবাবু মহাশয় আমাদের বলিয়া ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের বেনিফিট নাইটের "দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষার" ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য লইয়া যান, আরও কয়েকবার লইয়া গিয়াছিলেন।'

কিন্তু গিরিশবাবু এই উক্তির রীতিমত প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম,—

"বিনোদিনী হয়তো কেদারবাবু বা অন্য কাহারও নিকটে শুনিয়া থাকিবে যে আমি শরৎবাবুর নিকট হইতে বিনোদিনীকে যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছি। বিনোদিনীর প্রশংসার জন্য এ কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কিন্তু বিনোদিনী আমাদের থিয়েটারে আসিবার পর এক মাসের বেতন যাহা বেঙ্গল থিয়েটারে বাকী ছিল তাহা দুবার তাগাদা করিয়াও বিনোদিনীর মাতা প্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটার হইতে চলিয়া আসায় তথাকার কর্তৃপক্ষীয়েরা বিনোদিনীর উপর ক্রুদ্ধই হইয়াছিলেন।"

যাহা হউক সেই হইতে বিনোদিনী গিরিশচন্দ্রের নিকটে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে এবং যতদিন থিয়েটারে অভিনয় করিয়াছিল ততদিন তাঁহারই নিকটে ছিল।

পঞ্চম লহরী।

গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাপ্রদানের বিশেষত্ব।

---*---

কেদারবাবুর সত্ত্বাধিকারিত্বে ন্যাশন্যাল থিয়েটার অধিক দিন ছিল না। অনুমান এক বৎসর কাল কেদারবাবু থিয়েটার চালাইয়াছিলেন। বিনোদিনী ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথম প্রথম সে যে সকল ভূমিকা পূর্ব্বে অভিনয় করিয়াছিল সেই সকলই অভিনয় করিতে লাগিল। গিরিশচন্দ্র তখন আফিসে কার্য্য করিতেন সেইজন্য তিনি থিয়েটারসম্বন্ধে বিশেষ কিছু দেখিতে পারিতেন না, তথাপি তিনি যতটুকু সময় পাইতেন ততটুকুই থিয়েটারের জন্য প্রাণপাত করিতেন। কোথায়ও কখন কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী তাঁহার দৃষ্টি পথে পতিত হইলে ও তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত বুঝিলে, ন্যাশন্যাল থিয়েটারে আনিবার চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র একটী অভিনেতাকে এই থিয়েটারে লইয়া আসিলেন, ইনিই শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র। অমৃতবাবু প্রথম কেদারবাবুর থিয়েটারের অভিনেতা রূপে প্রবিষ্ট হন। গিরিশচন্দ্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি বড় বড় অভিনেতার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেদারবাবুর অদৃষ্টগুণে ন্যাশন্যাল থিয়েটার অধিক দিন তাঁহার হস্তে স্থায়ী হয় নাই।

কেদারবাবুর থিয়েটারে বিনোদিনী প্রবেশ করিয়া নিম্নলিখিত ভূমিকা-গুলি অভিনয় করে;—মেঘনাদে সাতটী ভূমিকা, বিষবৃক্ষে কুন্দ, সধবার একাদশীতে কাঞ্চন, মৃণালিনীতে মনোরমা, পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটেনিয়া প্রভৃতি।

এই ন্যাশন্যাল থিয়েটার হইতেই বিনোদিনীর ভাগ্য-লক্ষ্মী অনুকূল হন। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এতদিন পরে সে সত্যই সর্ব্বজন পরিচিতা অভিনেত্রী বলিয়া রঙ্গালয়ে বরণীয়া হয় ও তাহার যশোভাতি বাঙ্গালাময় ছড়াইয়া পড়ে। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের বিষয় বিনোদিনী "আমার কথায়" যাহা লিখিয়াছে তাহা অতি সুন্দর, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিলাম। বিনোদিনী লিখিতেছে,—

"যে সময় কেদারবাবু থিয়েটার করেন, সেই সময় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র মহাশয় আসিয়া অভিনয়কার্য্যে যোগদান করেন। গিরিশবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, যে অমৃতমিত্র আগে যাত্রার দলে এক্ট করিতেন। তাঁহার গলার সুন্দর স্বর শুনিয়া গিরিশবাবু তাঁহাকে প্রথমে থিয়েটারে লইয়া আসেন। উপরে উল্লেখ করিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে "মেঘনাদ বধ", "পলাশীর যুদ্ধ", "বিষ বৃক্ষ", "সধবার একাদশী", "মৃণালিনী" ও নানা বড় অথয়ের উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। "মেঘনাদ বধে" অমৃতলাল রাবণ সাজেন এবং আমি এখানেও সাতটি অংশ অভিনয় করিতাম। গিরিশবাবু মেঘনাদ ও রাম সাজিতেন। "মৃণালিনীতে" গিরিশবাবু পশুপতি, আমি মনোরমা, "দুর্গেশ নন্দিনীতে" গিরিশবাবু জগৎ সিংহ, আমি আয়েষা, "বিষ বৃক্ষে" গিরিশবাবু নগেন্দ্রনাথ, আমি কুন্দনন্দিনী, "পলাশীর যুদ্ধে" গিরিশবাবু ক্লাইব, আমি ব্রিটেনিয়া, অমৃত মিত্র জগৎ সেট ও কাদম্বিনী রাণী ভবানী। কত পুস্তকের নাম করিব। সকল পুস্তকেই আমার, গিরিশবাবুর, অমৃত মিত্রের, অমৃত বসু মহাশয়ের এই সকল বড় বড় পার্ট থাকিত। গিরিশবাবু আমাকে পার্ট অভিনয়ের জন্য অতি

যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথম পার্টগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর পার্ট মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মত আমাদের বাটীতে বসিয়া অমৃত মিত্র, অমৃত বাবু (ভুনীবাবু) আরও অন্যান্য লোকে মিলিয়া বিবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের কথাও বড় বড় বিলাতী কবি সেক্সপীয়র, মিল্‌টন্, বায়রণ, পোপ প্রভৃতির কবিতার মর্ম্ম গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখনও তাঁহাদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানা-বিধ হাব-ভাবের কথা এক এক করিয়া শিখাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় শিখিতে লাগিলাম। ইহার আগে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা পড়া পাখীর চতুরতার ন্যায়, আমার নিজের বড় একটা অভিজ্ঞতা হয় নাই। কোন বিষয় তর্ক বা যুক্তির দ্বারা কিছু বলিতে বা বুঝিতে পারিতাম না। এই সময় হইতে নিজের অভিনয়ে নির্ব্বাচিত ভূমিকা বুঝিয়া লইতে পারিতাম। বিলাতী বড় বড় এক্টার ও এক্ট্রেস আসিলে তাহাদের অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতাম। আর থিয়েটারের লোকেরাও আমাকে যত্নের সহিত লইয়া গিয়া ইংরাজি থিয়েটার দেখাইয়া আনিতেন। বাটী আসিলে গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি রকম দেখে এলে বলো দেখি।" আমার মনে যেখানে যেমন বোধ হইত তাঁহার কাছে বলিতাম। আমার যদি ভুল হইত, তিনি তাহা সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।"

"৺কেদারবাবু প্রায় একবৎসরকাল থিয়েটার করেন। ইহার পর কৃষ্ণধন ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া দুই ভাই কয়েক মাস থিয়েটারের কর্ত্তৃত্ব করেন। তাহার পর কাশীপুরের শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ চৌধুরীর বাটীর

শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিয়া এক ব্যক্তি ছয় মাস কি আট মাস এই থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার হন। এই সকল থিয়েটারেই গিরিশবাবু মহাশয় ম্যানেজার ও মোসান মাষ্টার ছিলেন। কিন্তু সকল প্রোপ্রাইটারই স্ব স্ব প্রধান। গিরিশবাবুও আফিসের কার্য্য করিয়া থিয়েটারে অধিক সময় যাপন করিতে পারিতেন না। ইহাতে এত বিশৃঙ্খলা ঘটিত* যে ব্যবসায় বুদ্ধিহীন আমোদপ্রিয় প্রোপ্রাইটারেরা শেষে থলি ঝাড়া হইয়া শূন্যহস্তে ইন্‌সল্‌ভেণ্টের আসামী হইয়া থিয়েটার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। তথাচ আমার বেশ মনে পড়ে যে সে সময় প্রতি রাত্রেই খুব বেশী লোক হইত ও এমন সুন্দররূপ অভিনয় হইত যে লোকে অভিনয় দর্শনে মোহিত হইয়া একবাক্যে বলিত যে আমরা অভিনয় দর্শন করিতেছি কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তাহা বোধ করিতে পারিতেছি না। এত বিক্রয়স্বত্বেও যে কেন সব ধনী সন্তানেরা সর্ব্বস্বান্ত হইতেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। লোকে বলিত যে এই যায়গাটা হানা যায়গা। এই স্থানের ভূমিখণ্ড কাহাকেও অনুকূল নহে।"

গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সৎ উপদেশ শুনিয়া আমি যখন ষ্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্য কেহ,—আমি যে চরিত্র লইয়াছি আমি যেন নিজেই সেই চরিত্র। কার্য্যশেষ হইয়া যাইলে আমার চমক ভাঙ্গিত। আমার এইরূপ কার্য্যে উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমায় বড়ই ভালবাসিতেন। কেহ বা কন্যার ন্যায় কেহ বা ভগিনীর ন্যায় কেহ বা সখীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। আমিও তাহাদের যত্নে ও আদরে তাঁহাদের উপর প্রবল স্নেহের অত্যাচার করিতাম। যেমন মা বাপের

কাছে আদরের পুত্র কন্যারা বিনা কারণে আদর আবদারের হাঙ্গামা করিয়া তাঁহাদের উৎকণ্ঠিত করে, ভ্রাতা ও ভগিনীদের নিকট যেমন তাহাদের কোলের ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলি মিছামিছি ঝগড়া ও আবদার করে, আমারও সেইরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছিল।"

"এই সময় নানারূপ উচ্চচরিত্র অভিনয় দ্বারা আমার মন যেমন উচ্চদিকে উঠিতে লাগিল, আবার নানারূপ প্রলোভনের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে আত্মহারা হইবার উপক্রম হইত।

""আমি ক্ষুদ্র দীন দরিদ্রের কন্যা, আমার বল বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র। একদিকে আমার উচ্চ বাসনা আত্মবলিদানের জন্য বাধা দেয়, অন্যদিকে অসংখ্য প্রলোভনের জীবন্ত চাকচিক্য মূর্ত্তি আমায় আহ্বান করে। এই-রূপ অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র হৃদয়ের বল কতক্ষণ থাকে! তবুও সাধ্যমত আত্মদমন করিতাম। বুদ্ধির দোষে ও অদৃষ্টের ফেরে সময় সময় আত্মরক্ষা না করিতে পারিলেও কখনও অভিনয় কার্য্যে অমনোযোগী হই নাই, অমনোযোগী হইবার ক্ষমতাও ছিল না। অভিনয়ই আমার সার সম্পৎ ছিল। পাঠ অভ্যাস, পাঠানুযায়ী চিত্রকে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে সেই সকল প্রকৃতির আকৃতি মনোমধ্যে স্থাপিত করিয়া তন্ময়ভাবে সেই চিন্তাঙ্কিত ছবিগুলিকে আপনার মধ্যে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখা, এমন কি সেই ভাবে চলা, ফেরা, শয়ন, উপবেশন যেন আমার স্বভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল।

"অন্য কথা বা অন্য গল্প আমার ভাল লাগিত না। গিরিশবাবু মহাশয় যে সকল বিলাতের বড় বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের গল্প করিতেন, যে সকল বই পড়িয়া শুনাইতেন, আমার তাহাই ভাল

লাগিত। মিসেস্ সিডন্স্ থিয়েটারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দশ বৎসর বিবাহিত অবস্থায় অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় যখন ষ্টেজে অবতীর্ণা হন, তখন তাঁহার অভিনয়ে কোন সমালোচক কোন স্থানে কিরূপ দোষ ধরিয়াছিলেন, কোন অংশে তাঁহার উৎকর্ষ বা ত্রুটী হইয়াছিল ইত্যাদি তিনি পুস্তক হইতে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেন। বিলাতে কোন একট্রেস্ বনের মধ্যে পাখীর আওয়াজের সহিত নিজের স্বর সাধিত তাহাও বলিতেন। এনেটারি কিরূপ সাজ সজ্জা করিত, ব্যাণ্ডম্যান কেমন হ্যাম্‌লেট সাজিত, ওফেলিয়া কেমন ফুলের পোষাক পরিত, বঙ্কিমবাবুর "দুর্গেশ-নন্দিনী" কোন পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত, রজনী কোন ইংরাজি পুস্তকের ভাব সংগ্রহে রচিত,—এই রকম কত কথা গিরিশ বাবু মহাশয়ের ও অন্যান্য স্নেহশীল বন্ধুগণের অনুগ্রহে ইংরাজী, গ্রীক্, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণি প্রভৃতি বড় বড় অথরের কত গল্প যে আমি শুনিয়াছি, তাহা আমি বলিতে পারি না। শুধু শুনিতাম না, তাহা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া সতত সেই সকল চিন্তা করিতাম। এই কারণে আমার স্বভাব এমন হইয়া গিয়াছিল যে যদি কখন কোন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইতাম, সেখানকার ঘর বাড়ী আমার ভাল লাগিত না, আমি কোথায় বন-পুষ্প শোভিত নির্জ্জন স্থান তাহাই খুঁজিতাম। আমার মনে হইত যে আমি বুঝি এই বনের মধ্যে থাকিতাম, আমি ইহাদের চিরপালিত। প্রত্যেক লতাপাতায় সৌন্দর্য্যের মাখামাখি দেখিয়া আমার হৃদয় লুটাইয়া পড়িত। আমার প্রাণ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিত। কখন কোন নদীতীরে যাইলে আমার হৃদয় যেন তরঙ্গে তরঙ্গে ভরিয়া যাইত, আমার মনে হইত আমি বুঝি এই নদীর তরঙ্গে তরঙ্গেই চিরদিন খেলা

করিয়া বেড়াইতাম। এখন আমার হৃদয় ছাড়িয়া এই তরঙ্গগুলি আপনা-আপনি লুটোপুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কুচ্‌বিহারের নদীর বালিগুলি অভ্র-বিমিশ্র, অতি সুন্দর, আমি প্রায় বাসা হইতে দূরে, নদীর ধারে একলাটি যাইয়া সেই বালির উপর শুইয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতাম। আমার মনে হইত উহারা বুঝি আমার সহিত কথা কহিতেছে।

"নানাবিধ ভাব সংগ্রহের জন্য সদাসর্ব্বক্ষণ মনকে লিপ্ত রাখায় আমি কল্পনার মধ্যেই বাস করিতাম, কল্পনার ভিতর আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিতাম। সেইজন্য বোধ হয় আমি যখন যে পার্ট অভিনয় করিতাম তাহার চরিত্রগত ভাবের অভাব হইত না। যাহা অভিনয় করিতাম তাহা যে অপরের চিত্তক্ষুন্ন করিবার জন্য বা বেতন ভোগী অভিনেত্রী বলিয়া কার্য্য করিতেছি উহা আমার কখন মনেই হইত না। আমি নিজে নিজেকে ভুলিয়া যাইতাম। অবিশ্রান্ত সুখ দুঃখ নিজেই অনুভব করিতাম, ইহা যে অভিনয় করিতেছি তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। সেই কারণে সকলেই আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

"একদিন বঙ্কিমবাবু তাঁহার মৃণালিনী অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় আমি মৃণালিনীতে মনোরমার অংশ অভিনয় করিতেছিলাম। মনোরমার অংশ অভিনয় দর্শন করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন 'আমি মনোরমার চরিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখনও যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিব তাহা মনে ছিল না। আজ মনোরমাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যে আমার মনোরমা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।' কয়েক মাস হইল এখনকার ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় এই কথায়ই বলিয়াছিলেন যে "বিনোদ, তুমি কি সেই বিনোদ,—যাহাকে দেখিয়া

বঙ্কিমবাবুও বলিয়াছিলেন 'আমার মনোরমাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি?" যেহেতু এক্ষণে আমি রোগে শোকে প্রায়ই শয্যাগতা।

"আমি অতি শৈশবকাল হইতেই অভিনয় কার্য্যে ব্রতী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির প্রথম বিকাশ হইতেই, গিরিশ বাবু মহাশয়ের শিক্ষাগুণে কেমন উচ্ছ্বাসময়ী হইয়া পড়িয়াছিলাম, কেহ কিছুমাত্র কঠিন ব্যবহার করিলে বড়ই দুঃখ হইত। আমি সততই আদর ও সোহাগ পাইতাম। আবার থিয়েটারের বন্ধুবর্গেরাও আমায় অত্যধিক স্নেহ ও আদর করিতেন। যাহা হউক এই সময় হইতেই আমি আত্মনির্ভর করিবার ভরসা হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়াছিলাম।"

উপর্য্যুপরি কয়েকজন সত্বাধিকারী পরিবর্ত্তনের পর ন্যাসানাল থিয়েটারের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। আপাদমস্তক ঋণজালে জড়িত। এ অবস্থায় আর থিয়েটার চলা অসম্ভব। সে সময় অন্য বাঙ্গালী ধনীর সন্তান থিয়েটার লইতে সাহস না করায় অতি অল্প দিনের মধ্যে নীলামে ন্যাসানাল থিয়েটার বিক্রীত হইয়া যায়। ১২৮৭ সালে প্রতাপলাল জহুরী নামে একজন ধনী মাড়োয়ারী উক্ত থিয়েটার নীলামে খরিদ করেন। প্রতাপলাল বাবু থিয়েটার খরিদ করিয়া আবার গিরিশ বাবুকেই অধ্যক্ষ রাখেন। আবার ন্যাসানাল থিয়েটার চলিতে আরম্ভ হয়। প্রতাপলাল বাবু থিয়েটার লইবার পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের "হামীর" নামে একখানি নাটক অভিনয় হয়। এই নাটকে বিনোদিনীর নায়িকার ভূমিকা ছিল। এই ভূমিকাটিও বিনোদিনী অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল। মহাসমারোহে হামীর উক্ত থিয়েটারে অভিনীত হইল বটে, কিন্তু লোক আকর্ষণ করিতে পারিল না। ভাল যে সকল নাটক ছিল তাহা সমস্তই পুরাতন হইয়া গিয়াছিল এ অবস্থায় থিয়েটারে লোক আকর্ষণ করা মহা সমস্যার বিষয়। গিরিশ বাবু নানা চিন্তা

করিয়া মায়া-তরু নামে একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য অতি সত্বর লিখিয়া ফেলিলেন ও উক্ত থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১২৮৭ সালের ১০ই মাঘ গিরিশচন্দ্রের মায়াতরু পলাশীর যুদ্ধের সহিত প্রথম অভিনীত হইল। দুই তিন রাত্রি এই গীতিনাট্যের অভিনয়ের পর হইতে আবার থিয়েটার লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল। এই গীতিনাট্যে শ্রীমতী বিনোদিনীর ফুল্লহাসির ভূমিকা ছিল। এই ভূমিকাটি বিনোদিনী এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে দর্শকগণ শত মুখে তাহার প্রশংসা করিয়াও শেষ করিতে পারে নাই। "রিজ এণ্ড রায়ত" সম্পাদক স্বর্গীয় শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মায়াতরুর অভিনয় দেখিয়া তাঁহার পত্রিকায় লেখেন, Benodini was simply charming (বিনোদিনী সত্যই মুগ্ধকারিণী)।

তাহার পর পরে পরে ন্যাসানাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের মোহিনী-প্রতিমা, আলাদিন, আনন্দরহো, রাবণ বধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যুবধ, লক্ষ্মন বর্জ্জন, সীতার বিবাহ, ব্রজ-বিহার, রামের বনবাস, সীতাহরণ, ভোটমঙ্গল, মলিনমালা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি পুস্তকগুলি মহাসমারোহে অভিনীত হয় ও সত্ত্বাধিকারী বিশেষ লাভবান্ হন। শ্রীমতী বিনোদিন মোহিনী-প্রতিমায় সাহানা, আনন্দরহো নাটকে লহনা, রাবণবধ ও সীতাহরণে সীতা, রামের বনবাসে কৈকেয়ী প্রভৃতি ভূমিকা গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক ভূমিকাটীই অতি উচ্চ অঙ্গের অভিনয় করে। প্রত্যেক অভিনয়েই সে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল।

প্রতাপলাল জহুরীর থিয়েটারে যখন বিনোদিনী অভিনেত্রীরূপে প্রবিষ্ট হয় সেই সময় সে একটি ভদ্রলোকের আশ্রিতা হয়। সেই ভদ্রলোক বিনোদিনীকে থিয়েটার করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু বিনোদিনীর প্রাণ

তখন থিয়েটারময় হইয়া গিয়াছিল, তাই সে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না। তখন তিনি বিনোদিনীকে বলিলেন,'তুমি যদি নিতান্তই থিয়েটার করিতে চাও তবে বেতন লইও না। তুমি যদি মাহিনা লইয়া থিয়েটার কর তাহা হইলে সেটা আমার অপমান হয়।' বিনোদিনী গিরিশ বাবু প্রভৃতির পরামর্শে সেই যুবককে মিথ্যা কথা বলিল যে সে থিয়েটারে বেতন গ্রহণ করিবে না, কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া বেতন আনিয়া সে তাহার মাতাকে প্রদান করিত। এইভাবে কিছুকাল ন্যাসানাল থিয়েটারে অভিনয় করিবার পর বিনোদিনীর সহিত অতি সামান্য কারণে প্রতাপলাল বাবুর বচসা হয় ও বিনোদিনী থিয়েটার ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু গিরিশ বাবু প্রভৃতির বিশেষ অনুরোধে আবার তাহাকে থিয়েটারে যোগদান করিতে হয়। বিনোদিনীর সহিত প্রতাপলাল বাবুর ব্যবহারে গিরিশ বাবু প্রতাপলাল জহুরীর উপর বিশেষ ক্ষুব্ধ হন ও ভিতরে ভিতরে আর একটী থিয়েটার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে থাকেন। বিনোদিনী এই সম্বন্ধে তাহার 'আমার কথা' নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছে আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। বিনোদিনী লিখিতেছে,—

"প্রতাপ বাবুর থিয়েটারে আসিবার ঠিক আগেই হউক অথবা প্রথম প্রথম সময়েই হউক, আমাদের অবস্থাগতিকে আমাকে একটি সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে থাকিতে হইত। তিনি অতিশয় সজ্জন ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতিশয় সুন্দর ছিল এবং আমাকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহগুণে আমায় তাঁহার কতক অধীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমে তাঁর ইচ্ছা ছিল যে আমি থিয়েটারে কার্য্য না করি, কিন্তু আমি ইহাতে কোনমতে রাজি হইলাম না, তখন তিনি বলিলেন, তবে তুমি অবৈতনিক (এমেচার) ভাবে কার্য্য কর। আমার গাড়ী ঘোড়া তোমায় লইয়া যাইবে ও লইয়া

আসিবে। আমি মহাবিপদে পড়িলাম। চিরকাল মাহিনা লইয়া কার্য্য করিয়াছি, এক্ষনে বেতন লইব না বলিলে তাঁহারা কি বলিবেন? সর্ব্বোপরি আমার মায়ের ধারণা যে থিয়েটারের পয়সা হইতে আমাদের দারিদ্রদশা ঘুচিয়াছে, অতএব ইহাই আমাদের লক্ষ্মী। তারপর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, আমার পক্ষেও সখের মত কাজ করা হইয়া উঠিত না। হাড়ভাঙ্গা মেহনত করিতে হইত, সেইজন্য সখেও বড় ইচ্ছা ছিল না। আমি এ কথা গিরিশবাবু মহাশয়কে বলিলাম। তিনি বলিলেন 'তাহাতে আর কি হইবে! তুমি বাবুকে বলিবে যে আমি মাহিনা লই না। তোমার মাহিনার টাকাটা আমি তোমার মার হাতে দিয়া আসিব।' যদিও প্রতারণা আমাদের ব্যবসায় বলিয়াই প্রতিপন্ন, তবুও আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আর আমি ঘৃণিতা বারনারী হইলেও অনেক উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছিলাম, প্রতারণা ও মিথ্যা ব্যবহারকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম। অবিশ্বাস আমাদের জীবনের মুলমন্ত্র হইলেও আমি সকলকেই বিশ্বাস করিতাম ও ভাল ব্যবহার পাইতাম। লুকোচুরি ভাড়াভাড়ি আমার ভাল লাগিত না। কি করিব দায়ে পড়িয়া আমার গিরিশবাবু মহাশয়ের কথায় সম্মত হইতে হইল। বাবুর সহিত গিরিশবাবুর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। তিনি গিরিশবাবুকে বড় সম্মান করিতেন। তিনি এত সজ্জন ছিলেন যে পাছে উঁহারা কিছু মনে সন্দেহ করেন বলিয়া কাজের আগেই আমায় থিয়েটারে পৌঁছাইয়াদিতেন। সে যাহা হউক প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার বেশ সুশৃঙ্খলায় চলিতেছিল। তিনিও অতি মিষ্টভাষী সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। এই স্থানে যে যে ব্যক্তি স্বত্ত্বাধিকারিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল প্রভাপ বাবুই ঋণগ্রস্ত হ'ন নাই। লাভ হইয়াছিল কি না তাহা জানি না, অবশ্য তাহা বলিতেন

না, তবে যে লোকসান হইত না তাহা জানা যাইত, কেন না প্রতি-রাত্রে অজচ্ছল বিক্রয় হইত, আর চারিদিকে সুনিয়মও ছিল। তাঁহার বন্দোবস্ত নিয়ম মত ছিল। সকল রকমে তিনি যে একজন ব্যবসায়ী লোক, তাহা সকলেই জানিতেন ও জানেন। ৹ * * * * * *

গিরিশবাবুর নূতন নূতন নাটক, গীতিনাট্য ও পাণ্টমাইমে আমাদের বড় বেশী রকম খাটিতে হইত। প্রতিদিন অতিশয় মেহনতে আমার শরীরও অসুস্থ হইতে লাগিল। আমি একমাসের জন্য ছুটী চাহিলাম। তিনি অনেক জেদা জেদির পর ১৫ দিনের ছুটি দিলেন। আমি সেই ছুটিতে শরীর সুস্থ করিবার জন্য ৺ কাশীধামে চলিয়া যাইলাম। কিন্তু সেখানে আমার অসুখ বাড়িল। সেই কারণে আমার ফিরিয়া আসিতে প্রায় এক মাস হইল। এখানে আসিয়া পুনরায় থিয়েটারে যোগ দিলাম, কিন্তু শুনিলাম যে প্রতাপ বাবু আমার ছুটির সময়েয় মাহিনা দিতে চাহেন না। গিরিশবাবু বলিলেন যে ছুটির মাহিনা না দিলে বিনোদ কাজ করিবে না। তখন বড় মুস্কিল হইল। যদিও স্পষ্ট শুনি নাই, তবু এই রকম শুনিয়া আমার একটুতে যেন মনের ভিতর আগুণ লাগিয়া যাইত,—আমি চোখে কিছু দেখিতে পাইতাম না। সেই দিনই প্রতাপ বাবু ভিতরে আসিলে আমি আমার মাহিনা চাহিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'মাহিনা কেয়া? ত্যোম তো কাম নেহি কিয়া?' আর কোথা আছে;—"বটে, মাহিনা দিবেন না" বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আর গেলাম না। তারপর গিরিশবাবু ও অমৃত মিত্র মহাশয় আমাদের বাটীতে আসিলেন। আমি তখন গিরিশবাবুকে বলিলাম যে 'মহাশয়, আমার বেশী মাহিনা চাহি, আর যে টাকা বাকী পড়িয়াছে তাহা চুক্তি করিয়া চাহি, নচেৎ কাজ করিব না।' তখন অমৃত

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "দেখ বিনোদ, এখন গোল করিও না। একজন মাড়োয়ারীর সন্তান একটী নূতন থিয়েটার করিতে চাহে, যত টাকা খরচ হয় সে করিবে। এখন কিছুদিন চুপ করিয়া থাক, দেখি কতদূর কি হয়।'

"এইখান হইতেই ষ্টার থিয়েটার হইবার সূত্রপাত আরম্ভ হইল। আমিও গিরিশবাবুর কথা অনুযায়ী আর প্রতাপ বাবুকে কিছু বলিলাম না। তবে ভিতরে ভিতরে সংবাদ লইতে লাগিলাম কে লোক নূতন থিয়েটার করিতে চাহে।"

১২৮৯ সালের শেষভাগে যখন গিরিশবাবু প্রভৃতির সহিত প্রতাপলাল জহুরীর নানারূপ মনান্তর ঘটিল এবং যখন গিরিশচন্দ্র একটী নূতন থিয়েটার খুলিবার জন্য একজন ধনীর আশ্রয় খুঁজিতেছিলেন, সেই সময় ৺গুর্ম্মুখ (গুরুমুখ) রায় থিয়েটার খুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি নিজে আসিয়াই গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটী নূতন থিয়েটার খুলিবার প্রস্তাব করিলেন। গিরিশবাবু হাতে স্বর্গ পাইলেন। তখন নূতন থিয়েটার কোথায় এবং কি ভাবে খোলা হইবে তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। থিয়েটার খোলার সব ঠিক ঠাক। সেই সময় সহসা একদিন গুর্ম্মুখ রায় মহাশয় বলিয়া বসিলেন, 'আমি থিয়েটার খুলিতে যত টাকা লাগে তাহার সমস্ত দিতেই প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনাদের অভিনেত্রী বিনোদকে আমার আশ্রয়ে থাকিতে হইবে। সেজন্যও আমি তাহাকে প্রচুর অর্থ দিতে প্রস্তুত আছি।"

গুর্ম্মুখ রায়ের এই প্রস্তাবে সকলেই বেশ একটু দমিয়া পড়িলেন। বিনোদিনী একজনের আশ্রয়ে রহিয়াছে, তাঁহার আশ্রয় ছাড়িয়া সে কি গুর্ম্মুখ রায়ের আশ্রয়ে থাকিতে রাজি হইবে? কিন্তু সে যদি রাজি

না হয় তাহা হইলে আর নূতন থিয়েটার খোলার আশা নাই। এদিকে প্রতাপলাল জহুরী মহাশয় যেরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকটেও থিয়েটার করা অসম্ভব। তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ হইল যেমন করিয়াই হউক ইহাতে বিনোদিনীকে সম্মত করাইতেই হইবে। যেমন পরামর্শ অমনি সেই অনুযায়ী কার্য্য। বিনোদিনীকে এ কথা বলা হইল। কিন্তু বিনোদিনী কথাটা একেবারেই উড়াইয়াদিল। সে একজনের আশ্রয় ছাড়িয়া বিনা কারণে অপরের আশ্রয়ে যাইতে কিছুতেই রাজি নহে। এদিকে গুর্ম্মুখ রায়ের মুখেও সেই এক কথা—'বিনোদিনী যদি না আমার আশ্রয়ে থাকিতে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে আমি একেবারেই থিয়েটার খুলিতে প্রস্তুত নহি।' কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া বিনোদিনীর বাড়ীতে ক্রমাগত যাতায়াত আরম্ভ হইল, এবং বহুদিন ধরিয়া নানাভাবে নানা দিক দিয়া বুঝাইবার পর শেষে বিনোদিনী সম্মত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যও আরম্ভ হইয়া গেল। বিনোদিনী গুর্ম্মুখ রায়ের আশ্রয়ে থাকিতে স্বীকৃত হইবামাত্র গুর্ম্মুখ রায় মহাশয় নূতন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং এক বৎসর যাইতে না যাইতে গুর্ম্মুখ রায়ের অর্থে ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হইল। এ সম্বন্ধে বিনোদিনী তাহার "আমার কথায়" যাহা লিখিয়াছে তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমিও এই সময় ৺প্রতাপবাবু মহাশয়ের থিয়েটার ত্যাগ করিব মনে করিয়াছিলাম। ইহার আগে আর একটী ঘটনার দ্বারা আমায় কতক ব্যথিত হইতে হইয়াছিল। আমি যে সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তিনি তখন অবিবাহিত ছিলেন। ইহার কয়েক মাস আগে তিনি বিবাহ করেন ও ধনবান্ যুবকবৃন্দের চঞ্চলতা বশতঃ আমার প্রতি কিছু অসৎ

ব্যবহারও করেন। তাহাতে আমাকে অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হয়। সেই কারণে আমি মনে করিলাম যে ঈশ্বর তো আমার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সামর্থ্য দিয়াছেন, এইরূপ শারিরীক মেহনতের দ্বারা নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে যদি সক্ষম হই, তবে আর দেহ বিক্রয় দ্বারা পাপ সঞ্চয় করিব না ও নিজেকেও উৎপীড়িত করিব না। আমা হইতে যদি একটী থিয়েটার ঘর প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে আমি চিরদিন অন্নস্থাপন করিতে পারিব। আমার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখনই ঐ ষ্টার থিয়েটার করিবার জন্য ৺গুর্ম্মুখ রায় ব্যস্ত। ইহা আমি আমাদের একটার দিকের মুখে শুনিলাম। ঘটনাচক্রে এই সময় আমার আশ্রয়দাতা সম্ভ্রান্ত যুবকও কার্য্যানুরোধে দূর দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এদিকে সকল অভিনেতাই আমাকে অতি জেদের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে 'তুমি যে প্রকারে পার আর একটী থিয়েটার করিবার সাহায্য কর।' থিয়েটার করিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না, তবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যায়রূপে আর একজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমার বিবেক বাধা দিতে লাগিল। এদিকে থিয়েটারের বন্ধুগণের কাতর অনুরোধ। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। গিরিশবাবু বলিলেন, 'থিয়েটারই আমার উন্নতির সোপান। তাঁহার শিক্ষা সাফল্য আমার দ্বারাই সম্ভব। থিয়েটার হইতে মান সম্ভ্রম জগদ্বিখ্যাত হয়।' এইরূপ উত্তেজনায় আমার কল্পনা স্ফীত হইতে লাগিল। থিয়েটারের বন্ধু বর্গেরা দিন দিন অনুরোধ করিতেছেন, এবং আমি মনে করিলেই একটী নূতন থিয়েটার সৃষ্টি হয় তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু যে যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তাঁহাকেও স্মরণ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই যুবা সুদীর্ঘকাল যাবৎ

অনুপস্থিত। সুতরাং উপস্থিত বন্ধুবর্গের কাতরোক্তিতে মন থিয়েটারের দিকেই টলিল। তখন ভাবিতে লাগিলাম, 'যিনি আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি আমার সহিত যে সত্যে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন, অপর পুরুষ যেমন প্রতারণা বাক্য প্রয়োগ করে তাঁহারও সেইরূপ। তিনি পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিয়াছিলেন যে আমিই তাঁহার কেবল একমাত্র ভালবাসার বস্তু, আজীবন সে ভালবাসা থাকিবে। কিন্তু কই তাহা তো নহে! তিনি বিষয় কার্য্যের ছলনা করিয়া দেশে গিয়াছেন। কিন্তু উহা বিষয় কার্য্য নহে, তিনি বিবাহ করিতে গিয়াছেন। তবে তাঁহার ভালবাসা কোথায়? এতো প্রতারণা! আমি কি নিমিত্ত বাধ্য থাকিব? এইরূপ নানা যুক্তি হৃদয়ে উঠিতে লাগিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আবার মনে হইতে লাগিল যে তাঁহার কোন দোষ নাই, তিনি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি তাঁহার একমাত্র ভালবাসার পাত্রী— তবে একি করিতেছি! রাত্রিতে এ ভাব উদয় হইলে অনিদ্রায় যাইত। কিন্তু প্রাতে বন্ধুবর্গ আসিলে অনুরোধতরঙ্গ ছুটিত ও রাত্রির মনোভাব একেবারে ঠেলিয়া ফেলিত। অবশেষে থিয়েটার করিব সঙ্কল্প করিলাম।

* * * *

"থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম। কেন করিব না? যাঁহাদের সহিত ভাই ভগিনীর মত একত্রে কাটাইয়াছি, যাহাদের আমি চির বশীভূত, তাঁহারাত সত্য কথাই বলিতেছেন। আমার দ্বারা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে চিরকাল একত্রে ভাই ভগিনীর ন্যায় কাটিবে। সংকল্প দৃঢ় হইল। গুর্ম্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম। একের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপরের আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের চির প্রথা হইলেও এ

অবস্থায় আমায় বড় চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়াছিল। হয়তো লোকে শুনিয়া হাসিবেন যে আমাদেরও আবার ছলনার প্রত্যবায় বোধ বা বেদনা আছে। যদি কেহ স্থির চিত্তে ভাবেন তাহা হইলে বুঝিতে পারেন যে আমরাও রমণী। এ সংসারে যখন ঈশ্বর আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তখন নারী হৃদয়ের সকল কোমলতায়তো বঞ্চিত করিয়া পাঠান নাই, সকলই দিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে সকলই হারাইয়াছি। তবে ইহাতে কি সংসারের দায়িত্ব কিছুই নাই? যে কোমলতায় একদিন হৃদয়পূর্ণ দিন তাহা একেবারে নির্ম্মূল হয় না, তাহার প্রমাণ সন্তানপালনে। পতিপ্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব! কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় ভাসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদেরও হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিত হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন? বিষ্ণুপরায়ণ প্রাতঃস্মরণীয় হরিদাসকে প্রতারিত করিবার জন্য আমাদেরই বারাঙ্গনা একজন প্রেরিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণবের ব্যবহারে তিনিও বৈষ্ণবী হন এ কথা বিশ্বময় ব্যাপ্ত। যদি হৃদয় না থাকিত, সম্পূর্ণ হৃদয়শূন্য হইলে, কদাচ তিনি বিষ্ণুপরায়ণা হইতে পারিতেন না। অর্থ দিয়া কেহ কাহারও ভালবাসা কেনেন নাই। আমরাও অর্থে ভালবাসা বেচি নাই। এই আমাদের সংসারের রীতি। নাট্যাচার্য্য গিরিশবাবু মহাশয়ের যে বারাঙ্গনা বলিয়া একটী কবিতা আছে, তাহাই এই দুর্ভাগিনীদের প্রকৃত ছবি—"ছিল অন্য নারী সম হৃদয় কমল।" অনেক প্রদেশে জল জমিয়া পাষাণ হয়, আমাদেরও তাহাই। উৎপীড়িত অসহায়

অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া হৃদয় কঠোর হইয়া উঠে। যাহা হউক এখন ওকথা থাকুক। এই পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থান্তর গ্রহণ করিতে আমাকে ও থিয়েটারের লোক দিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। কেন না যখন সেই সম্ভ্রান্ত যুবক শুনিলেন যে আমি অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটী থিয়েটারে চিরদিন সংলগ্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তখন তিনি ক্রোধ বশতই হউক কিংবা নিজের জেদ বশতই হউক নানারূপ বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বাধা বড় সহজ নহে। তিনি নিজের দেশ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিলেন। গুর্ম্মুখ রায় ও বড় বড় গুণ্ডা লাগাইলেন। মারামারি পুলিশ হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। এমন কি একদিন জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইয়াছিল। একদিন রিহা-র্সলের পর আমি আমার ঘরে ঘুমাইতেছিলাম। ভোর ছয়টা হইবে, ঝন্ঝন্ ঝম্ঝম্ শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি যে মিলিটারী পোষাক পরিয়া তরোয়াল বাঁধিয়া সেই যুবক একেবারে আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "বিনো, এত ঘুম কেন?" আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলে, তিনি বলিলেন, "দেখ বিনোদ, তোমাকে উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। তোমার জন্য যে টাকা খরচ হইয়াছে আমি সকলই দিব। এই দশ হাজার টাকা লও, যদি বেশী হয় তবে আরও দিব।" আমি চিরদিনই এক গুঁয়ে ছিলাম, কেহ জেদ করিলে আমার এমন রাগ হইত যে আমার দিগ্বিদিক্ কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকিত না। যাহা রোক করি-তাম কিছুতেই তাহা টলাইতে পারিত না। মিষ্ট কথায়, স্নেহের আদরে যাহা করিব স্থির করিতাম, কেহ জোর করিয়া নিষেধ করিলে তাহা শুনিতাম না। আমায় জোরের সহিত কাজ করান সহজসাধ্য ছিল না।

তাহার ঐরূপ উদ্ধত ভাব দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল, আমি বলিলাম, "না, কথনই নহে, আমি উহাদের কথা দিয়াছি, এখন কিছুতেই ব্যতিক্রম করিতে পারিব না।"

তিনি বলিলেন, "যদি টাকার জন্য হয় তাহা হইলে আমি তোমায় আরোও দশ হাজার টাকা দিব।" তাঁহার কথায় আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। দাঁড়াইয়া বলিলাম, "রাখ তোমার টাকা। টাকা আমি উপার্জ্জন করিয়াছি বই টাকা আমায় উপার্জ্জন করে নাই। ভাগ্যে থাকে অমন দশ বিশ হাজার টাকা কত আসিবে, তুমি এখন চলিয়া যাও।" আমার এই কথা শুনিয়া তিনি আগুনের মতন জ্বলিয়া নিজের তরওয়ারে হাত দিয়া বলিলেন, "বটে! ভেবেছ কি যে তোমায় সহজে অপরের হাতে ছাড়িয়া দিব, তোমায় শত খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব। যে বিশহাজার টাকা তোমায় দিতে চাহিতেছিলাম তাহা অন্য উপায়ে খরচ করিব, পরে যাহা হয় হইবে—"বলিতে বলিতে ঝপ করিয়া কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া চক্ষের নিমিষে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক আঘাত করিলেন। আমার দৃষ্টিও তাঁহার তরবারির দিকে ছিল। যেমন তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমি অমনি একটি টেবিল হারমোনিয়ম ছিল তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম, আর সেই তরবারির চোট হারমোনিয়ামের ডালার উপরে পড়িয়া ডালার কাট তিন আঙ্গুল কাটিয়া গেল। নিমেষ মধ্যে পুনরায় তরওয়াল তুলিয়া আবার আঘাত করিলেন। তাঁর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, আমারও মৃত্যু নাই, সে আঘাতও যে চৌকিতে বসিয়া বাজান হইত, তাহাতে পড়িল, মুহূর্ত্তমধ্যে আমি উঠিয়া তাঁহার পুনর্ব্বার উত্তোলিত তরওয়াল-শুদ্ধ হস্ত ধরিয়া বলিলাম, 'কি করিতেছে, আমাকে যদি কাটিতে হয়

পরে কাটিও ; কিন্তু তোমার পরিণাম ? আমার কলঙ্কিত জীবন যাইল আর থাকিল তা'তে ক্ষতি কি ? একবার তোমার পরিণাম ভাব, তোমার বংশের কথা ভাব। একটা ঘৃণিত বারাঙ্গনার জন্য এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া সোণার সংসার হইতে চলিয়া যাইবে ! ছি ! ছি ! শুন, স্থির হও। কি করিতে হইবে বল। ঠাণ্ডা হও।"

শুনিয়াছিলাম দুর্দ্দমণীয় ক্রোধের প্রথম বেগ দমিত হইলে লোকের প্রায় হিতাহিত চিন্তা ফিরিয়া আইসে। এখানেও তাহাই হইল। তিনি হাতের তরওয়াল দূরে ফেলিয়া দিয়া মুখে হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সে সময়ের কাতরতা বড়ই কষ্টকর। আমার মনে হইল যে সব দূরে যাউক, আমি আবার ফিরিয়া আসি। কিন্তু চারিদিক্ হইতে তখন অষ্টবজ্র দিয়া থিয়েটারের বন্ধুগণ ও গিরিশ বাবু মহাশয় আমায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন, কোন দিকে ফিরিবার পথ ছিল না। যাহা হউক সে আকস্মিক বিপৎ হইতে তখন তো পার পাইলাম—তিনি কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে আমরা যে কয়জন একত্রিত হইয়াছিলাম, সকলে ৺প্রতাপ বাবুর থিয়েটার ত্যাগ করিলাম। তখন গুর্ম্মুখ বাবুও ধরিলেন যে আমি একান্ত তাঁর বশীভূত না হইলে তিনি থিয়েটারের জন্য কোন কার্য্য করিবেন না। কাজে কাজেই গোলযোগ মিটাইবার জন্য পরামর্শ করিয়া আমাকে মাস কতক দূরে রাখিতে সকলে বাধ্য হইলেন। কখনও রাণীগঞ্জে কখনও এখানে ওখানে আমায় থাকিতে হইল। ইহার ভিতর কেমন ও কিরূপ থিয়েটার হইবে এইরূপ কার্য্য চলিতে লাগিল। পরে যখন সব স্থির হইল যে বিডন ষ্ট্রীটে প্রিয়মিত্রের যায়গা লিজ্ লইয়া এতদিন থিয়েটার হইবে, এত টাকা খরচ হইবে তখন আমি

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আমি কলিকাতায় আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন গুর্ম্মুখ বাবু বলিলেন, "দেখ বিনোদ, আর থিয়েটারের গোলযোগে কাজ নাই, তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার নিকটে লও। আমি একেবারে তোমায় দিতেছি।" এই বলিয়া কতকগুলি নোট বাহির করিলেন। আমি অন্তরের সহিত থিয়েটার ভাল বাসিতাম, সেই নিমিত্ত ঘৃণিত বারনারী হইয়াও অৰ্দ্ধ লক্ষ টাকার প্রলোভন তখনই ত্যাগ করিলাম। যখন অমৃত মিত্র প্রভৃতি শুনিলেন যে গুর্ম্মুখ রায় থিয়েটার না করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা আমায় দিতে চান, তখন তাঁহাদের চিন্তার সীমা রহিল না।

যাহাতে আমি সে অর্থ গ্রহণ না করি, ইহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইল হইল না, কিন্তু এ সমস্ত চেষ্টা তখন নিষ্প্রয়োজন। আমি স্থির করিয়াছি থিয়েটার করিব। থিয়েটারের ঘর প্রস্তুত না করিয়া দিলে আমি কোন মতে তাঁর বাধ্য হইব না। তখন আমারই উদ্যমে বিডন ষ্ট্রীটে জমি লিজ্ লওয়া হইল, এবং থিয়েটারনির্ম্মাণের জন্য গুর্ম্মুখ রায় অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। উক্ত বিডন ষ্ট্রীটেই শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী ভাড়া লইয়া রিহারস্যাল আরম্ভ হইল। তখন একে একে সব নূতন পুরাতন একটর একট্রেস্ আসিয়া যোগদান করিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু মহাশয় মাষ্টার ও ম্যানেজার হইলেন এবং বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় এখনকার ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও আসিলেন। ইহার আগে ইনি বেঙ্গল থিয়েটার লিজ্ লন। তখন বোধ হয় আমরা প্রতাপ বাবুর থিয়েটারে। * * * * * সেই সময় প্রফেসর জহরলাল ধর ষ্টেজ্ ম্যানেজার হন। দাশু বাবু যদিও

ছেলে মানুষ, কিন্তু কার্য্য শিখিবার জন্য গিরিশবাবু মহাশয় উহাকে সহকারী ষ্টেজ ম্যানেজার করেন এবং হিসাব পত্র ভাল ভাবে থাকিবে ও বন্দোবস্ত সব সুশৃঙ্খলে হইবে বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু মহাশয়কে আনিয়া সকল ভার দেন। হরিবাবু মহাশয় চিরদিনই বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্। গিরিশবাবু নূতন থিয়েটারের বেশী উন্নতি করিবার জন্য শিক্ষাকার্য্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন বলিয়া নিজে সকল কাজ দেখিতে পারিতেন না। সেইজন্য সুযোগ্য দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদের উপর এক এক কার্য্যের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সহিত কার্য্য চলিতে লাগিল। এই সময় আমরা বেলা দুই তিনটার সময় রিহারস্যালে গিয়া সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া থিয়েটারে আসিতাম, এবং অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইলে আমি নিজে ঝুড়ি করিয়া মাটী বহিয়া পিট ও ব্যাক সিটের স্থান পূর্ণ করিতাম। কখন কখন মজুরদের উৎসাহের জন্য চারি কড়া করিয়া কড়ি ধার্য্য করিয়া দিতাম। শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত করিবার জন্য রাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্য হইত। সকলে চলিয়া যাইতেন। আমি, গুর্ম্মুখ বাবু, আর দুই একজন রাত্রি জাগিয়া কার্য্য করাইতাম। আমার সেই সময়ের আনন্দ দেখে কে! অপরিসীম উৎসাহে অনেক পয়সা ব্যয়ে থিয়েটার প্রস্তুত হইল। বোধ হয় এক বৎসরের ভিতর হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার সহিত আর একটী কথা আমি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। থিয়েটার যখন প্রস্তুত হয় তখন সকলে আমায় বলেন যে "এই যে থিয়েটার হাউস হইবে, তোমার নামের সহিত ইহার যোগ থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরেও তোমার নামটী বজায় থাকিবে অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম

বি থিয়েটার হইবে।" এই আনন্দে আমি আরোও উৎসাহিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কার্য্যকালে উঁহারা সে কথা রাখেন নাই কেন তাহা জানি না। যে পর্য্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া রেজেষ্ট্রী না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত আমি জানিতাম আমারই নামে উহার নাম হইবে। কিন্তু যে দিন উঁহারা রেজেষ্ট্রী করিয়া আসিলেন—তখন সব হইয়া গিয়াছে, থিয়েটার খুলিবার সপ্তাহ কয়েক মাত্র বাকি। আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম 'থিয়েটারের নূতন নাম কি হইল'। দাশুবাবু প্রসন্নভাবে বলিলেন যে "ষ্টার"। এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয়মধ্যে অতিশয় আঘাত পাইয়া একেবারে বসিয়া যাইলাম, দুই মিনিট কাল কথা কহিতে পারিলাম না। কিছু পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম "বেশ।" পরে মনে ভাবিলাম যে "উহারা কি শুধু আমায় মুখে স্নেহ মমতা দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিলেন! কিন্তু কি করিব, আমার আর কোন উপায় নাই। আমি তখন একেবারে উহাদের হাতের ভিতরে। আর আমি স্বপনেও ভাবি নাই যে উহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমন ভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এত টাকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমার যা না কষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ মনঃকষ্ট হইয়াছিল। যদিও এ সম্বন্ধে আর কাহাকেও কোন কথা বলি নাই, কিন্তু ইহা ভুলিতেও পারি নাই, ঐ ব্যবহার বরাবর মনে ছিল। বলা বৃথা বলিয়া আর কিছু বলি নাই। আর, থিয়েটার আমার বড় প্রিয়, থিয়েটারকে বড়ই আপনার মনে করিতাম। যাহা হউক আর একটী তো নূতন থিয়েটার হইল, সেই কারণে সেই সময় তাহা চাপাও পড়িয়া যাইত। কিন্তু থিয়েটার প্রস্তুত হইবার পরও সময় সময় ভাল ব্যবহার পাই নাই। আমি যাহাতে

উক্ত থিয়েটারে বেতনভোগী অভিনেত্রী হইয়াও না থাকিতে পারি তাহার জন্যও সকলে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহাদের উদ্যোগ ও যত্নে আমাকে মাস দুই ঘরে বসিয়াও থাকিতে হইয়াছিল। তাহার পর আবার গিরিশ বাবুর যত্নে ও স্বত্বাধিকারীর জেদে আমায় পুনরায় যোগ দিতে হইয়াছিল। লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে প্রোপ্রাইটার বলিয়াছিলেন, 'ইহাতো বড় অন্যায়,—যাহার দরুণ থিয়েটার করিলাম তাহাকে বাদ দিয়া কার্য্য করিতে হইবে! এ কথন হইবে না। তাহা হইলে সব পুড়াইয়া দিব।' সে যাহা হউক এক সঙ্গে থাকিতে হইলে ত্রুটি অনেক হইয়া থাকে, আমারও শত সহস্র দোষ ছিল। কিন্তু অনেকেই আমায় বড় স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ মাননীয় গিরিশ বাবুর স্নেহাধিক্যে আমার মান অভিমান একটু বেশী প্রভুত্ব করিত; সেই জন্য দোষ আমারই অধিক হইত। কিন্তু আমার অভিনয় কার্য্যের উৎসাহের জন্য সকলেই প্রশংসা করিতেন, এবং দোষ ভুলিয়া আমার প্রতি স্নেহের ভাগই অধিক বিকাশ পাইত। আমি তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম স্নেহ কখনও ভুলিতে পারিব না। এই থিয়েটারে অবস্থানকালীন কোন সুকার্য্য করিয়া থাকি আর না করিয়া থাকি, প্রবৃত্তির দোষেও বুদ্ধির বিপাকে অনেক অন্যায় করিরাছি সত্য। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, সহিতে হইয়াছে। এইরূপ নানারূপ টান বেটানের পর যখন নূতন "ষ্টারে" নূতন নাটক দক্ষযজ্ঞের অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন সকলেরই মনোমালিন্য এক রকম দূর হইয়া গিয়াছিল। সকলেই জানিত এই থিয়েটারটী আমাদের নিজের। আমরা ইহাকে যেমন বাহ্যিক চাকৃচিক্যময় করিয়াছি তেমনি গুণগরিমপূর্ণ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য আরো অধিক করিব। সেই কারণ সকলে আনন্দে, উৎসাহে একমনে অভিনয়ের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যত্ন করিতেন।"

১২৯০ সালের ৬ই শ্রাবণ ষ্টার থিয়েটার শ্রীযুক্ত গুর্ম্মুখ রায়ের অর্থে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ নাটক লইয়া প্রথম উন্মুক্ত হইল। ৬ই রাত্রে মহাসমারোহে দক্ষযজ্ঞ প্রথম অভিনীত হয়। এই প্রথম অভিনয় রজনীতে গিরিশ বাবু দক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র মহাদেব সাজিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু (ভূনিবাবু) দধীচির ভূমিকা লইয়াছিলেন, বিনোদিনী সতীর অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, আর কাদম্বিনী প্রসূতি সাজিয়াছিল। নূতন ষ্টারে নূতন দক্ষযজ্ঞের অভিনয় কত সুন্দর হইয়াছিল তাহা ভূমিকা দেখিলেই স্পষ্ট অনুমিত হয়। সে দিন রাত্রে "ষ্টার" থিয়েটারে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে আসনের অভাবে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকেই ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। বিনোদিনী তাহার সতীর ভূমিকা এত সুন্দর করিয়াছিল যে সেরূপ অভিনয় আজকালকার অভিনেত্রীর করা অসম্ভব। বিনোদিনী সতীর ভূমিকা এত সুন্দর করিয়াছিল তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জীবনে কখন ভুলিতে পারিবেন না। দর্শকগণ ও থিয়েটারের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার অভিনয়ের শতমুখে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিল। বিনোদিনীর দক্ষযজ্ঞে সতীর অভিনয় সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন ;—

"দক্ষযজ্ঞে সতীর ভূমিকা আদ্যোপান্ত বিনোদিনীর দক্ষতার পরিচয়। সতীর মুখে একটী কথা আছে "বিয়ে কি মা ?"—এই কথাটি অভিনয় করিতে অতি কৌশলের প্রয়োজন। যে অভিনেত্রী পর অঙ্কে মহাদেবের সহিত যোগ-কথা কহিবে, এইরূপ বয়স্কা স্ত্রীলোকের মুখে "বিয়ে কি মা ?" শুনিলে ন্যাকাম মনে হয়। সাজ সজ্জার হাবভাবে বালিকার ছবি দর্শককে না দিতে পারিলে, অভিনেত্রীকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিনোদিনীর

অভিনয়ে বোধ হইত, যেন দিগম্বর-ধ্যান-মগ্না বালিকা সংসার-জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মাতাকে "বিয়ে কি মা ?" প্রশ্ন করিয়াছে। পর অঙ্কে দয়াময়ী জগজ্জননী জীবের নিমিত্ত অতি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কহ, নাথ !
কি হেতু কহিলে—
"ধন্য ধন্য কলিযুগ ?"
ক্ষুদ্র নর অন্নগত প্রাণ,
রিপুর অধীন সবে,
রোগ শোকে সন্তাপিত ধরা,
পন্থাহারা মানব মণ্ডল
ভীম ভবার্ণব মাঝে,—
কেন কহ বিশ্বনাথ,—"ধন্য কলিযুগ ?"

যোগিনীবেশে যোগেশ্বরের পার্শ্বে জগজ্জননী এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন,— ইহা বিনোদিনীর অভিনয়ে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইত। তেজস্বিনীর মহাদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ, মাতাকে প্রবোধ দান,—

"শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর ;—
প্রজা রক্ষা কেমনে গো হবে ?
নারী যদি পতিনিন্দা স'বে,
কার তরে গৃহী হবে নর ?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
মাগো পতি নিন্দা কেন স'ব ?"

এ কথায় যেন সতীত্বের দীপ্তি প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অথচ দৃঢ়-বাক্যে পূজ্য স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতি-নিন্দায় প্রাণের ব্যাকুলতা, তৎপরে প্রাণত্যাগ, স্তরে স্তরে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইত।"

দক্ষযজ্ঞ কিছুদিন মহাসুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইবার পর ১২৯০ সালের সালের ২রা শ্রাবণ গিরিশচন্দ্রের ধ্রুবচরিত্রের ষ্টারে অভিনয় হয়। বিনোদিনী সুরুচির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই ভূমিকাটীও বিনোদিনী অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল। ইহার পর ১২৯০ সালের ১লা পৌষ ষ্টারে গিরিশচন্দ্রের "নলদময়ন্তীর" অভিনয় হয়। শ্রীমতী বিনোদিনী দময়ন্তীর ভূমিকা গ্রহণ করে। দময়ন্তীর ভূমিকা বিনোদিনীর পৌরাণিক অভিনয়ের যুগের একটি আদর্শ অভিনয়। বিনোদিনীতে দর্শকবৃন্দ মূর্ত্তিমতী বৈদর্ভীই প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ ও চরিতার্থ হইত। ফলতঃ তাদৃশ অভিনয় আর কখনও অপর কোনও অভিনেত্রীর দ্বারা কোনও ষ্টেজে হয় নাই।

বিনোদিনীর আর একটী বিশেষ ক্ষমতা ছিল ভূমিকার উপযোগী সাজিতে ও সাজাইতে সে অদ্বিতীয় ছিল। নলদময়ন্তীর প্রথম অভিনয় রজনীতে নল ও দময়ন্তীকে রঙ্‌ ও ড্রেস্ করিবার জন্য কলিকাতার কোন এক সুবিখ্যাত রঙ্‌-কারক সাহেবকে লইয়া আসা হয়। তাঁহার নলকে রঙ্‌ করিবার সময় যখন শ্রীমতী বিনোদিনীকে তাঁহার নিকট রঙ্‌ করিতে বলা হয় তখন বিনোদিনী বলে যে 'নিজে না পারি উহার নিকট রঙ্‌ করিতে চাহি না। আমি নিজেই রঙ্‌ করিব।' সে নিজেই রঙ্‌ করে এবং সে রঙ্‌ সেই সাহেবের রঙ্‌ হইতে আরও সুন্দর হইয়াছিল। সেই হইতে বিনোদিনীই নলকে রঙ্‌ করিত। এই সম্বন্ধে বিনোদিনী তাহার আমার কথায় লিখিয়াছে,—

"অমৃতবাবু যত বার "নল" সাজিতেন ততবারই আমি রঙ্ করিয়া দিতাম। অন্য কেহ রঙ্ করিয়া দিলে তাঁর পছন্দ হইত না। ইহার দরুণ অন্য একট্রেস্‌রা সময়ে সময়ে অসন্তুষ্ট হইত। আমার একদিন তাড়াতাড়ি থাকাতে বনবিহারিণী (ভূনী) নাম্নী একজন অভিনেত্রী বলিয়াছিল যে, "আসুন অমৃতবাবু, আমি রঙ্ করিয়া দিই।" অমৃতবাবু তাহার উত্তরে বলেন যে "রঙ্ ও পোষাক সম্বন্ধে বিনোদের পছন্দ সকলের হইতে উচ্চতর।"

১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে গিরিশচন্দ্রের "হীরার ফুল" অভিনীত হয়। বিনোদিনী এই গীতিনাট্যে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ভূমিকাটী অতি ক্ষুদ্র, তথাপি তাহাতেই বিনোদিনী এমন একটু বিশেষত্ব দিয়াছিল, যে "হীরার ফুলে" আর তেমন নায়িকা আজ পর্য্যন্ত হইল না। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"এক্ষণে অভিনয়দর্শনে দর্শকের ধারণা হয় যে, রতিই হীরার ফুল গীতিনাট্যের নায়িকা, কিন্তু যিনি হীরার ফুলে বিনোদিনীকে দেখিয়াছেন তাঁহার ধারণা যে হীরার ফুলে গ্রন্থকার রচিত নায়িকাই নায়িকা, রতি নায়িকা নয়।"

শ্রীযুক্ত গুর্ম্মুখ রায় প্রায় এক বৎসরকাল ষ্টার থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী ছিলেন, তাহার পর নানা কারণে তিনি থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত হরিভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত দাশুচরণ (দাশরথি) নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু কিছু কিছু টাকা নিজেরা দিয়া ও কিছু টাকা শ্রীযুক্ত হরিধন দত্তের নিকট হইতে ধার করিয়া গুর্ম্মুখবাবুর নিকট হইতে ষ্টার থিয়েটার খরিদ করিয়া লইলেন। এই সময় আবার একটু গোল উঠিয়াছিল। গুর্ম্মুখবাবু বলিলেন, যদি বিনোদিনীর থিয়েটারে একটী সেয়ার না থাকে তাহা হইলে আমি থিয়েটার কিছুতেই বিক্রয়

করিব না। কিন্তু গিরিশবাবু বিনোদিনী ও বিনোদিনীর মাতাকে অনেক বুঝাইয়া সে প্রস্তাব রহিত করেন। বিনোদিনী এ সম্বন্ধে তাহার আমার কথায় লিখিয়াছে,—

"সেই সময় গুর্মুখবাবুর ইচ্ছায় আমারও সমান অংশ লইবার কথা উঠিল। লোক পরম্পরায় শুনিলাম যে গুর্ম্মুখ বাবু বলিয়াছেন যে ইহাতে বিনোদের অংশ না থাকিলে আমি কখনই উহাদিগকে দিব না। এই প্রস্তাবে কিন্তু গিরিশবাবু মহাশয় রাজি হইলেন না। তিনি আমার মাকে বলিলেন "বিনোদের মা, ওসব ঝঞ্ঝাটে তোমাদের কাজ নাই। তোমরা স্ত্রীলোক, অত ঝঞ্ঝাট সহিতে পারিবে না। আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে কাজ নাই। তোমার মেয়েকে ফেলিয়া তো আমি কখনও অন্যত্র কার্য্য করিব না, আর থিয়েটার করিতে হইলে বিনোদ যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমরা কার্য্য করিব, বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই। গাধার পিটে বোঝা দিয়া কার্য্য করিব।" গিরিশবাবুর এই সকল কথা শুনিয়া মা আমার কোন মতেই রাজি হইলেন না, যেহেতু আমার মাতাঠাকুরাণীও গিরিশ বাবু মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার কথা অবহেলা করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। এই রকম নানাবিধ ঘটনায় ও রটনায় বহু দিবসাবধি লোকের মনে ধারণা ছিল যে "ষ্টারে" আমার অংশ আছে।"

ষ্টার থিয়েটার গুর্ম্মুখ রায়ের হস্ত হইতে অমৃতবাবু প্রভৃতির হস্তে আশায় তাঁহাদের উৎসাহ আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। গিরিশচন্দ্র যদিচ সত্বাধিকারী হইলেন না, তথাপি থিয়েটার যাহাতে চিরস্থায়ী হয় সেজন্য তাঁহার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। যদি তাঁহার সে সময় সামান্য মাত্র গাফিলী থাকিত,

তাহা হইলে অকালেই ষ্টারের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যাইত। গুর্ম্মুখ রায়ের হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইবামাত্র থিয়েটারের আয় বৃদ্ধির জন্য অতি সত্বর গিরিশচন্দ্র "চৈতন্য লীলা" নাটক রচনা করিলেন ও মহাসমারোহে মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই "চৈতন্যলীলায়" চৈতন্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াই শ্রীমতী বিনোদিনীর জীবন স্বার্থক হইয়া গেল। চৈতন্যের ভূমিকা বিনোদিনী যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করিয়াছিল সেরূপ আর কেহই করিতে পারিল না। বিনোদিনীর পর বহু অভিনেত্রী এই চৈতন্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে ও বহুবার অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু বিনোদিনীর ন্যায় তাদৃশ জীবন্ত ভাব আর কাহারও অভিনয়ে আজ পর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত হয় নাই। চৈতন্যলীলা অভিনয় সম্বন্ধে বিনোদিনী আমার কথায় লিখিয়াছে,—

"এইবার চৈতন্যলীলা নাটক লিখিত হইল ও শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইল। এই চৈতন্যলীলার রিহার্সালের সময় "অমৃত বাজার" পত্রিকার এডিটার বৈষ্ণব-চূড়ামণি পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় মাঝে মাঝে আসিতেন এবং আমার ন্যায় হীনার দ্বারা সেই দেবচরিত্র যাহাতে যতদূর সম্ভব সুরুচি-সম্পন্ন হইয়া অভিনীত হইতে পারে তাহার উপদেশ দিতেন এবং বার বার বলিতেন "আমি যেন সতত গৌর পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিতপাবন, পতিতের উপর তাঁহার অসীম দয়া।" তাঁর কথামত আমিও সতত ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতাম। আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইত যে কেমন করিয়া অকূল পাথারে কূল পাইব। মনে মনে সদাই ভাবিতাম, "হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই পতিতা অধমাকে দয়া করুন।" যেদিন প্রথম চৈতন্যলীলার অভিনয় করি তাহার আগের রাত্রে প্রায় সারা রাত্রি নিদ্রা যাই নাই, প্রাণের

মধ্যে একটা আকুল উদ্বেগ হইয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া গঙ্গা স্নানে যাইলাম, পরে ১০৮ একশত আটটি দুর্গা নাম লিখিয়া তাঁহার চরণে ভিক্ষা করিলাম, "মহাপ্রভু যেন আমায় এই মহা সঙ্কটে কূল দেন। আমি যেন তার কৃপা লাভ করিতে পারি।" সারা দিন ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া রহিলাম। পরে জানিলাম, আমি যে তাঁর অভয় পদে স্মরণ লইয়াছিলাম তাহা বোধ হয় ব্যর্থ হয় নাই। কেন না তাঁর যে দয়ার পাত্রী হইয়াছিলাম তাহা বহুসংখ্যক সুধীবৃন্দের মুখেই ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমি মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে ভগবান আমায় কৃপা করিতেছেন, কেন না সেই বাল্যলীলার সময়— "রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী" বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম "কি দেখ মালিনী", সেই সময় আমার চক্ষু বর্হিদৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয় মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম যেন দেখিতাম! আমার মনে হইত "ঐ যে গৌরাঙ্গ" উনিই তো বলিতেছেন, আমি কেবল মন দিয়া শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহারই কথা প্রতিধ্বনিত করিতেছি! আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সমস্ত শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত, চারিদিক্ যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। যখন আমি অধ্যাপকের সহিত তর্ক করিয়া বলিতাম "প্রভু কেবা কার, সকলই সেই কৃষ্ণ"—তখন সত্যই মনে হইত যে প্রভু কেবা কার। পরে যখন উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া বলিতাম,—

"গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,
বিষ্ণুপদপঙ্কজে করিছে মধু পান,
কত শত কোটি কোটিঅশরীরী প্রাণী !"

তখন মনে হইত বুঝি আমার বুকের ভিতর হইতে এই সকল কথা আর কে বলিতেছে ! আমি তো কেহই নহি, আমাতে আমি জ্ঞানই থাকিত না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাতা শচী দেবীর নিকট বিদায় লইবার সময় যখন বলিতাম—

"কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননী,
কেঁদ না নিমাই বলে।
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকল পাবে,
কাঁদিলে নিমাই বলে,
নিমাই হারাবে, কৃষ্ণ নাহি পাবে।"

তখন স্ত্রীলোক দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেন যে আমার বুকের ভিতর গুরগুর করিতে থাকিত। আবার শচীমাতার সেই হৃদয়ভেদী মর্ম্মবেদনার শোকধ্বনি, নিজের মনের উত্তেজনা ও দর্শকবৃন্দের ব্যগ্রতা আমায় এত অধীর করিত যে আমার নিজের দুই চক্ষের জলে নিজে আকুল হইয়া পড়িতাম। শেষে সন্ন্যাসী হইয়া সঙ্কীর্ত্তন মাঝে 'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়, আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায়"—এই গানটি গাইবার সময়ের মনোভাব আমি লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমার সত্যই তখন মনে হইত, 'আমিও ভবে একা, কেহ তো আমার আপনার নাই।' আমার প্রাণ যেন ছুটিয়া গিয়া হরিপাদপদ্মে আপনার আশ্রয় স্থান খুঁজিত।

আমি উন্মত্তের ন্যায় সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতাম ও এক একদিন এমন হইত যে অভিনয়ের গুরুভার বহিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অভিনয় করিতে করিতে মধ্যস্থানেই অচৈতন্য হইয়া পড়ি। সেদিন অতিশয় লোকারণ্য হইয়াছিল। চৈতন্যলীলার অভিনয়ে প্রায়ই অধিক লোক হইত। তবে যখন কোন কার্য্য উপলক্ষে বিদেশী লোক জন আসিতেন তখন আরোও রঙ্গালয় পূর্ণ হইত এবং প্রায় অনেকগুলি লোকই আসিতেন। সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-অধ্যাপক ফ্যাদার লাফেঁা সাহেব সেই দিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি ড্রপ পড়িতেই ষ্টেজের ভিতর গিয়াছিলেন। আমার ঐ রকম অবস্থা শুনিয়া তিনি গিরিশবাবু মহাশয়কে বলেন, 'চলুন, আমি একবার দেখিব।" গিরিশবাবু তাঁহাকে আমার গ্রিণরুমে লইয়া যাইলেন। পরে যখন আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিতে পাইলাম, একজন মস্ত বড় দাড়ীওয়ালা সাহেব কি না ইজের জামা পরা আমার মাথার উপর হইতে পা পর্য্যন্ত হস্তচালনা করিতেছেন। আমি উঠিয়া বসিতে গিরিশবাবু বলিলেন, 'ইঁহাকে নমস্কার কর। ইনি মহামহিমান্বিত পণ্ডিত ফ্যাদার লাফেঁা।' আমি তাঁর নাম শুনিতাম, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। আমি হাত যোড় করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি আমার মাথায় খানিক হাত দিয়া এক গ্লাস জল খাইতে বলিলেন। আমি এক গ্লাস জল পান করিয়া বেশ সুস্থ হইয়া আপন কার্য্যে ব্রতী হইলাম। অন্য সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে যেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িতাম, এবার তাহা হই নাই। কেন তাহা বলিতে পারি না। এই চৈতন্যলীলা অভিনয়ের জন্য আমি যে কত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়গণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। পরম পূজনীয় নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রেমিক পণ্ডিত মথুরানাথ

পদরত্ন মহাশয় ষ্টেজের মধ্যে আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার পবিত্র পদধূলিতে আমার মস্তক পূর্ণ করিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি মহা-প্রভুর দয়ায় কত ভক্তিভাজন সুধীগণের কৃপার পাত্রী হইয়াছিলাম! এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে—শুধু চৈতন্যলীলার অভিনয়ে নহে,—আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্যলীলার অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয়। এই অভিনয় দ্বারা আমি পতিত পাবন ৺পরমহংস দেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম, কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অভিনয় কার্য্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন আফিস ঘরে তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন, 'হরি গুরু হরি গুরু বল মা হরি গুরু গুরু হরি।' তাহার উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন, "মা তোমার চৈতন্য হ'ক্।" তাঁর সেই প্রসন্ন সুন্দর ক্ষমাময় মূর্ত্তি আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি! পাতকী তারণ পতিত পাবন মহাপ্রভূ যে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয় দিয়াছিলেন! হায় আমি বড়ই ভাগ্যহীনা অভাগিনী। আমি তবুও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আবার মোহ জড়িত হইয়া জীবনকে নরক সদৃশ করিয়াছি।"

"আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই, তখনও সেই রোগক্লান্ত তথাপি প্রসন্ন বদনে আমায় বলিলেন, "আয় মা বোস্।" তাহা কি স্নেহপুর্ণ ভাব—এ নরকের জীবকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান! যে দিন তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের (পরে যিনি বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিত

হইয়াছিলেন) সত্যং শিবং মঙ্গল গীতি মধুর কণ্ঠে থিয়েটারে বসিয়া শ্রবণ করিয়াছি, আমার থিয়েটারকার্য্যকর দেহকে এই জন্য ধন্য মনে করিয়াছি। এখন জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন তাহাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না, কেন না আমি জানি যে পরমারাধ্য পরম পূজনীয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব আমায় কৃপা করিয়াছেন। তাঁহার সেই মধুর পীযূষপূরিত বাণী 'হরি গুরু গুরু হরি' আমায় আজও আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়ভারে আহত হইয়া পড়ি তখনই যেন সেই ক্ষমাময় প্রসন্ন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলেন বল, 'হরি গুরু গুরু হরি।' এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন মনে নাই। তবে বক্সে যেন তাঁহার সেই প্রসন্ন প্রফুল্লময় মূর্ত্তি আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি।"

যে চৈতন্যলীলায় চৈতন্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া শ্রীমতী বিনোদিনী পরমহংস দেবের কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছিল সে চৈতন্যলীলার ভূমিকা যে কত সুন্দর হইয়াছিল তাহা লেখাই বাহুল্য। এই চৈতন্যলীলার চৈতন্যের ভূমিকা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"বলা হইয়াছে যে সকল ভূমিকাতেই বিনোদিনী সাধারণের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিল। কিন্তু "চৈতন্য লীলায়" চৈতন্য সাজিয়া তাহার জীবন সার্থক হয়। এই ভূমিকার বিনোদিনীর অভিনয় আদ্যোপান্তই ভাবুক-চিত্ত-বিনোদন। প্রথমে বাল গৌরাঙ্গ দেখিয়া ভাবুকের বাৎসল্যের উদয় হইত, চঞ্চলতায় ভগবানের বাল্যলীলার আভাস পাইতেন। উপনয়নের সময় রাধাপ্রেমে মাতোয়ারা বিভোর দণ্ডী দর্শনে দর্শক স্তম্ভিত হইতেন। গৌরাঙ্গমূর্ত্তির ব্যাখ্যা "অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃ রাধা—পুরুষ-প্রকৃতি এক সঙ্গে

জড়িত।" এই পুরুষ-প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন 'কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই' বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইত, তখন প্রকৃত বিরহ-বিধুরা রমণীরই আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তম ভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসক হন। এই অভিনয় পরমহংস দেব দেখিতে যান। প্রকৃত হরিনাম হইলে যে হরি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন, পরমহংস দেব স্বয়ং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন; পদধূলি লাভে কেহই বঞ্চিত হইল না। বিনোদিনী অতি ধন্যা। পরমহংস দেব করকমল দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন,—তোমার "চৈতন্য হোক।" অনেক পর্ব্বত গহ্বরবাসী এ আশীর্ব্বাদ প্রার্থী। বিনোদিনীর যে সাধনায় ভগবান এরূপ প্রসন্ন হইলেন সেই সাধনাই অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইলে অভিনেতাকে অবলম্বন করিতে হয়। বিনোদিনীর সাধন—যথাজ্ঞান কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। যে ব্যক্তি যে অবস্থাতেই হউক, এই মহাছবি ধ্যান করিবে, সেই ব্যক্তি এই ধ্যানপ্রভাবে ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া মোক্ষলাভ করিবে। অষ্ট প্রহর গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ধ্যানের ফল বিনোদিনীর ফলিয়াছিল।"

ইহার পর ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের প্রহ্লাদ চরিত্র ও নিমাই সন্ন্যাস অভিনয় হয়। নিমাই সন্ন্যাসে বিনোদিনী চৈতন্যের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এই ভূমিকাটীও সে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। ১২৯২ সালের ৪ঠা আশ্বিন গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব চরিত্র ষ্টারে মহাসমারোহে অভিনীত হয়।

এই ভূমিকাটী অভিনয়ে বিনোদিনী লাইট অব্ এসিয়া রচয়িতা এড্উইন আরনেল্ড সাহেবের নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধদেবে "গোপার" ভূমিকা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"বুদ্ধদেব" নাটকে পতি বিরহ-ব্যাকুলা গোপার ছন্দকের নিকট

"দাও, দাও ছন্দক আমায়,
পতির বসন ভূষা—মম অধিকার!
স্থাপি সিংহাসনে,
নিত্য আমি পূজিব বিরলে

বলিয়া পতির পরিচ্ছদ যাচ্ঞা এক প্রকার অতুলনীয় হইত। সে অন্ধো-ন্মাদিনীর বেশ—আগ্রহের সহিত স্বামীর পরিচ্ছদ হৃদয়ে স্থাপন এখনও আমার চক্ষে জাগরিত। যাহাকে পূর্ব্বাঙ্কে অপ্সরোনিন্দিত সুন্দরী দেখা যাইত, পরিচ্ছদ যাচ্ঞার সময় তাপ-শুষ্ক পদ্মের মত মলিন বোধ হইত।"

ভূমিকার উপযোগী বেশ বিন্যাস করিতে বিনোদিনী যে অদ্বিতীয়া ছিল, সে বিষয়ে আর কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সে সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"তাহার (বিনোদিনীর) ভূমিকা উপযোগী পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইবার বিশেষ কৌশল ছিল। একটী দৃষ্টান্তে তাহার কতক প্রকাশ পাইবে। বুদ্ধদেবের অভিনয়ে বিনোদিনা গোপার ভূমিকা গ্রহণ করিত। একদিন ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় বলরাম বসু "বুদ্ধদেব" দেখিতে যান। তিনি এক অঙ্ক দেখিবার পর সহসা সজ্জা গৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেন যে তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইল, তাহা আমি জিজ্ঞাসা না করিয়া কনসার্টের সময় তাঁহাকে ভিতরে লইয়া যাইলাম। তিনি এদিক ওদিক দেখিয়া

কনসার্ট বাজিতে বাজিতেই ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি গল্প করিয়াছিলেন যে তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর গোপাকে প্রথমে দেখিয়া ভাবিয়া-ছিলেন যে এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী থিয়েটারওয়ালারা কোথায় পাইলেন? তিনি সেই সুন্দরীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সাজঘরে তাহাকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, রঙ্গমঞ্চে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেরূপ সুন্দরী নয় সত্য, কিন্তু সুন্দরী বটে। তৎপর একদিন অসজ্জিত অবস্থায় দেখিয়া সেই স্ত্রীলোক যে গোপা সাজিয়াছিল তাহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বিনোদিনীর সাজসজ্জার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। সজ্জিত হইতে শেখা অভিনয়-কার্য্যের প্রধান অঙ্গ, এ শিক্ষায় বিনোদিনী বিশেষ নিপুণা ছিল। বিনোদিনী ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায়, সজ্জা দ্বারা আপনাকে এরূপ পরিবর্ত্তিত করিতে পারিত যে, তাহাকে এক ভূমিকায় দেখিয়া অপর ভূমিকায় যে সেই আসিয়াছে, তাহা দর্শক বুঝিতে পারিতেন না। সাজ সজ্জার প্রতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সজ্জিত হইয়া দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে অনেক সময়ে অভিনেতার হৃদয়ে নিজ ভূমিকার ভাব প্রস্ফুটিত হয়। দর্পণ অভিনেতার সামান্য শিক্ষক নয়। সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে হাবভাব প্রকাশ করিয়া যিনি ভূমিকা (পার্ট) অভ্যাস করেন, তিনি সাধারণের নিকটে বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। কিন্তু এরূপ অভ্যাস করা কষ্টসাধ্য। শিক্ষাজনিত অঙ্গভঙ্গী স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গীর ন্যায় অভ্যাস করা এবং স্বেচ্ছায় তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ শ্রম ও চিন্তা সাধ্য। এ শ্রম ও চিন্তা ব্যয়ে বিনোদিনী কখন কুণ্ঠিত ছিল না।"

১২৯৩ সালের ২০শে আষাঢ় গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল" নাটক মহা

সমারোহে "ষ্টার" থিয়েটারে অভিনীত হয়। উক্ত নাটকে শ্রীমতী বিনোদিনী চিন্তামণির ভূমিকা গ্রহণ করে। বিল্বমঙ্গল সেই হইতে আজি পর্য্যন্ত বহু রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছে এবং বড় বড় অভিনেত্রী চিন্তামণির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বিনোদিনী যেরূপ চিন্তামণির ভূমিকা করিয়া গিয়াছে সেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় আজ পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই। বিনোদিনীর অভিনয়ের বিশেষত্বই ছিল এইটুকু যে তাহার প্রত্যেক অভিনয়েই বেশ একটু প্রাণ থাকিত। বেতনভোগী অভিনেত্রীর মুখস্থ পার্ট বলার মত তাহার অভিনয় ছিল না। দর্শকগণের সত্যাই ধারণা হইত যে তাঁহারা অভিনয় দেখিতেছেন না, যথার্থই সেই মানুষটাকেই দেখিতেছেন। ইতি মধ্যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর বিবাহবিভ্রাট প্রহসন অভিনীত হয়। এই প্রহসনে বিনোদিনী বিলাসিনী কারফরমার ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং ভূমিকাটি এত সুন্দর অভিনয় করে যে দর্শকগণ যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। যে অভিনেত্রী চৈতন্যের ন্যায় ভাব প্রবণ ভূমিকা অমন সুন্দর অভিনয় করে সে আবার কেমন করিয়া এই লঘুভাবের ভূমিকা এমন সুন্দর অভিনয় করিতে পারে? সত্যাই ইহা আশ্চর্য্যের কথা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজ পর্য্যন্ত বিনোদিনী যে ভূমিকাই লইয়াছে তাহাতেই বেশ একটু বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। বিনোদিনীর লঘুভাবের ভূমিকা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"গুরু গম্ভীর ভূমিকায় (Serious part) বিনোদিনীর যেরূপ অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশিত হইয়াছে, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে ফতেমার ভূমিকায়, "বিবাহ-বিভ্রাটে" বিলাসিনী কারফর্ম্মার ভূমিকায়, "চোরের উপর বাটপাড়িতে" গিন্নির ভূমিকায়, এবং "সধবার একাদশীতে" কাঞ্চনের হালকা

ভূমিকায়ও বিনোদিনীর অভিনয়ে তাদৃশ দক্ষতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, পঞ্চরং, নক্‌সা প্রভৃতিতে সে সময় বিনোদিনীই নায়িকা ছিল।"

রঙ্গমঞ্চে যশে ও প্রশংসায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া, দর্শক-মণ্ডলীকে নাট্যকলার নানা রসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শ্রীমতী বিনোদিনী একদিন এই বঙ্গদেশে যুগান্তর আনিয়াছিল। এত খ্যাতি ও যশঃ আজ পর্য্যন্ত কোন অভিনেত্রীর ভাগ্যে ঘটে নাই। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য যে এহেন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে রঙ্গালয়ে অধিক দিন রাখিতে পারিল না। কি কারণে বা কেন যে বিনোদিনী রঙ্গালয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করিল তাহার সঠিক সংবাদ আমরা জানিতে পারি নাই,তবে যে কারণেই হউক কারণটা যে বিশেষ একটা কিছু গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই। থিয়েটারের এত যশঃ, এত সুখ্যাতি, পরিত্যাগ করিতে বিনোদিনীর নিশ্চয়ই বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অনুমান ১২৯৩ সালের শেষভাগ হইতে শ্রীমতী বিনোদিনী রঙ্গালয়ের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া গৃহে বসিয়া আছে, আর কখনও কোনও থিয়েটারে কোন ভূমিকা অভিনয় করে নাই। থিয়েটার ছাড়িবার কারণ সম্বন্ধে শ্রীমতী বিনোদিনী তাহার আমার কথায় লিখিয়াছে,—

"কিন্তু পরিশেষে নানারূপ মনোভঙ্গের দ্বারা থিয়েটারে কার্য্য করা দুরূহ হইয়া উঠিল। যাঁহারা এক সঙ্গে কার্য্য করিবার কালীন সমসাময়িক স্নেহময় ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, সখা ও সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারাই ধনবান্, উন্নতিশীল অধ্যক্ষ হইলেন। বোধ হয় সেই কারণে অথবা আমারই অপরাধে নানা দোষ হইতে লাগিল। কাজেই আমার থিয়েটার হইতে অবসর লইতে হইল।"

সে যাহা হউক, যে কারণেই হউক্, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী

বিনোদিনী

বিনোদিনী অতি সামান্য দিনমাত্র অভিনয়ের কার্য্য করিয়া রঙ্গালয় ত্যাগ করিয়াছে। যদি অন্যরূপ হইত, অর্থাৎ যদি আরো কিছুদিন শ্রীমতী বিনোদিনী বঙ্গরঙ্গালয়ে থাকিত, তাহা হইলে আমরা আরও অনেক নূতন জিনিষ দেখিতে পাইতাম। বিনোদিনী থিয়েটারের সম্পর্ক পরিত্যাগ করায় বঙ্গরঙ্গালয়ের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীমতী বিনোদিনী যে কেবল মাত্র একজন সুদক্ষ অভিনেত্রী ছিল তাহা নহে, বঙ্গরঙ্গালয়স্থাপনের সে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তাহার সাহায্য সে সময় না পাইলে থিয়েটার স্থাপনের কত দূর কি হইত বলা যায় না। সেজন্য শ্রীমতী বিনোদিনীর নিকট নাট্যমোদী মাত্রেরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এ বিষয় বিনোদিনী তাহার আমার কথায় এক স্থানে লিখিয়াছে,—

"আজ জগৎ যোড়া যশের বোঝা লইয়া সংসার ক্ষেত্রে যে "ষ্টার থিয়েটারের" নাম উন্নত বক্ষে অবস্থান করিতেছে, সেও একদিন এই ক্ষুদ্রাপপি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে বিশেষ আত্মীয় বলিয়া মনে করিত। এক্ষণে শত আরাধনায় যাঁহাদের একবারমাত্র দেখা পাওয়া যায় না, এমন দিন গিয়াছে যে এই অতি ক্ষুদ্রশক্তি আত্মত্যাগ না করিলে হয়তো কোন আঁধারের কোণে তাঁহাদের পড়িয়া থাকিতে হইত।"

যাহা হউক শ্রীমতী বিনোদিনীই সাধারণ বঙ্গ রঙ্গালয়ের আদি যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। তাহার কার্য্যের জন্য বঙ্গরঙ্গালয় চিরদিনই তাহার কাছে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ থাকিবে।

শেষ কথা।

—*—

অনুমান ১২৭৯ সালে শ্রীমতী বিনোদিনী প্রথমে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করে ও ১২৯৩ সালে রঙ্গালয় পরিত্যাগ করে। সে কেবলমাত্র ১৪ বৎসর থিয়েটারে অভিনয় করিয়াছে। শ্রীমতী বিনোদিনী অনুমান ৯।১০ বৎসর বয়সে থিয়েটারে প্রবেশ করিয়াছিল ও ২৪।২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সে বহু নাটকে বহু পার্ট গ্রহণ করিয়াছে ও প্রত্যেকটিতে সুনাম লইয়াছে। এত অল্পদিনের মধ্যে এত যশঃ ও এত সুনাম বঙ্গ রঙ্গালয়ে কোনও অভিনেত্রীর ভাগ্যে ঘটে নাই। সে অতিবালিকা বয়সে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া "বেণী সংহার" নাটকে দ্রৌপদীর সখী, "হেমলতা" নাটকে হেমলতা, "সতী কি কলঙ্কিনী" গীতিনাট্যে রাধিকা, "নবীন তপস্বিনী" নাটকে কামিনী, "সধবার একাদশীতে" কাঞ্চন ও "বিয়ে পাগলা বুড়ো" নাটকে রতির ভূমিকার অভিনয় করে। তারপর গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমতী বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া "মেঘনাদ বধ" নাটকে চিত্রাঙ্গদা, প্রমিলা, বারুণী, রতি, মায়া, মহামায়া, সীতা—এই সাতটি ভূমিকার অভিনয় করে। তথায় সে "মৃণালিনীতে" মনোরমা, "দুর্গেশনন্দিনীতে" আয়েষা, তিলোত্তমা ও আসমানী, এবং "সরোজিনী" নাটকে সরোজিনীর ভূমিকার অভিনয় করে। তাহার পর গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে পুনঃ প্রবেশ করিয়া শ্রীমতী বিনোদিনী, দোললীলা, আগমনী ও কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহসনে প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ

করে। তাহার পর প্রতাপলাল জহুরীর হস্তে যখন ন্যাশন্যাল থিয়েটার আসে সেই সময় সে "মায়াতরু" গীতিনাট্যে ফুল্লহাসি, "পলাশীর যুদ্ধে" ব্রিটেনীয়া, "মোহিনী-প্রতিমায়" সাহানা, "আনন্দ রহোতে" লহ্না, "রাবণ বধে" সীতা, "সীতাহরণে" সীতা, রামের বনবাসে কৈকেয়ী ও "বিষবৃক্ষে", কুন্দনন্দিনীর ভূমিকার অভিনয় করে। তাহার পর যখন ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হইল তখন সে "দক্ষযজ্ঞে" সতী, "ধ্রুবচরিত্রে" সুরুচি, "নলদময়ন্তীতে" দময়ন্তী, "চৈতন্যলীলায়" চৈতন্য, "নিমাই সন্ন্যাসে" চৈতন্য, "বুদ্ধ দেবে" গোপা, "বিল্বমঙ্গলে" চিন্তামণি, "কপাল-কুণ্ডলায়" কপাল-কুণ্ডলা ও "বিবাহ বিভ্রাটে" বিলাসিনী কারফরমার ভূমিকা গ্রহণ করে।

ইহাহইতে বেশ দেখা যায় যে শ্রীমতী বিনোদিনী প্রায় ত্রিশখানি নাটকে প্রায় পঞ্চাশটি ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে, উহাদের প্রায় প্রত্যেক ভূমিকাই নাটকের প্রধান ভূমিকা, এবং প্রত্যেকের অভিনয়েই নাট্যকলার চরম বিকাশ প্রদর্শন করিয়াছে। ঈশ্বর দত্ত যে শক্তি লইয়া শ্রীমতী বিনোদিনী বঙ্গনাট্যশালায় প্রবেশ করিয়াছিল তাহার সে শক্তি সার্থক হইয়াছে। আজি প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর শ্রীমতী বিনোদিনী কোন রঙ্গালয়ে নাই, কিন্তু আজিও তাহার যশের কথা, তাহার শক্তির কথা, প্রত্যেক নাট্যামোদী ব্যক্তির মুখে প্রচারিত হইতেছে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী বিনোদিনী চন্দ্রমাস্বরূপ ছিল। সে রঙ্গালয়ে যে বিমল সুধাময় রশ্মিরাজি বিকিরণ করিয়া গিয়াছে, যতদিন বঙ্গে নাট্যশালা থাকিবে ততদিন বঙ্গবাসী তাহা ভুলিতে পারিবে না। বাঙ্গালা রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীর অভাব দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি কখনও আবার শ্রীমতী বিনোদিনীর মত অভিনেত্রী বঙ্গ রঙ্গালয়ে জন্মগ্রহণ করে তবে আবার নাটকের পূর্ণ সৌষ্টব বিকাশ

প্রাপ্ত হইবে। নিজের অস্তিত্ব না ভুলিলে প্রকৃত অভিনেত্রী হওয়া যায় না। শ্রীমতা বিনোদিনী অভিনয় কালে নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইত। শ্রীমতী বিনোদিনী প্রাণপণ সাধনা করিয়াছিল এবং সে তদনুরূপ সিদ্ধিলাভও করিতে পারিয়াছিল। অভিনয় করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ এ একটা কম শক্তির পরিচয় নহে।

আমরা সংক্ষেপে শ্রীমতী বিনোদিনীর নাট্যজীবনের অনেক ঘটনাই লিপিবদ্ধ করিলাম। শ্রীমতী বিনোদিনীর জীবনী পাঠ করিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবেন কেমন করিয়া বঙ্গে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠালাভ হইল। নাট্যামোদী প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিনোদিনীর জীবনী পাঠ করা উচিত। শ্রীমতী বিনোদিনী যে কেবলমাত্র অভিনেত্রী ছিল তাহা নহে, তাহার গুণও যথেষ্ট ছিল। সে একজন সুলেখিকা। তাহার লিখিত দুই তিন খানি পুস্তক বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে বিরাজ করিতেছে। ইহা ব্যতীত তাহার দান ও কর্ম্ম যথেষ্ট আছে।

শেষ কথা প্রত্যেক অভিনেত্রীরই বিনোদিনীর মত হইবার চেষ্টা করা উচিত। বিনোদিনীর মত যদি আজি প্রত্যেক অভিনেত্রী নাট্যশালার জন্য জীবন উৎসর্গ করে, তাহা হইলে বঙ্গ নাট্যশালার এরূপ দিন দিন আর অভিনেত্রীর অভাব হয় না। যাহারা অভিনেত্রী হইয়া রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতেছে, তাহাদের কি শ্রীমতী বিনোদিনীর মত সুযশে মণ্ডিত হইবার ইচ্ছা হওয়া উচিত নয়? যতদিন নাট্যশালা থাকিবে ততদিন বিনোদিনী অমর হইয়া থাকিবে, কেননা আদর্শ অভিনয় করিয়া শ্রীমতী বিনোদিনী অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এ সৌভাগ্য লক্ষে একজনের ভাগ্যে ঘটে কিনা সন্দেহ।

তারাসুন্দরী।

প্রথম লহরী।

রঙ্গালয়ে প্রবেশ।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে যে কয়জন অভিনেত্রী অভিনয়কলার চরম বিকাশ প্রদর্শন করিয়া মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, শ্রীমতী তারাসুন্দরী তাহাদিগের অন্যতমা। ১২৮৬ সালে কলিকাতার কোন এক অজ্ঞাত পল্লীতে শ্রীমতী তারাসুন্দরী জন্মগ্রহণ করে। শ্রীমতী তারাসুন্দরীর মাতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। তাঁহার দুইটী কন্যা। তিনি বড়টীর নাম রাখিয়াছিলেন নৃত্যকালী ও ছোটটীর নাম রাখিয়াছিলেন তারাসুন্দরী। তাঁহার বড়ই অনাটনের সংসার ছিল। তিনি যে কত কষ্টে তাঁহার এই কন্যা দুইটীকে মানুষ করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। সে যাহা হউক শ্রীমতী তারাসুন্দরী যে পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেই পল্লীর সন্নিকটেই সুবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী বাস করিত। বিনোদিনীর মাতার সহিত তারাসুন্দরীর মাতার এক পল্লীতে বাসের জন্য পরস্পরে বেশ আলাপ ও সৌহার্দ্দ ছিল। তারাসুন্দরী যখন নিতান্ত বালিকা সেই সময় বিনোদিনী তাহাকে অভিনেত্রী করিবার জন্য ষ্টার থিয়েটারে লইয়া যায়। সেই হইতে তারাসুন্দরী প্রত্যহই শ্রীমতী বিনোদিনীর সহিত ষ্টার থিয়েটারে গমন করিত।

কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত সে বিশেষ কোন ভূমিকা পাইল না, কেবল "চৈতন্যলীলায়" কয়েকবার বালকবেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, ৫ যাবৎ ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় যে বাটীতে অভিনয় করিতেছিলেন, সেই বাটীখানি ধনকুবের গোপাললাল শীল মহাশয় কিনিয়া লয়েন এবং তিনি সেই বাটীখানি আগাগোড়া সংস্কার করিয়া এমারেল্ড থিয়েটার নাম দিয়া একটী নূতন থিয়েটারের উদ্বোধন করেন। ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়গণ একটী নূতন থিয়েটার বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য হাতীবাগানে জমি ক্রয় করেন। কিন্তু এক দিনে তো আর একটী প্রকাণ্ড থিয়েটার বাটী নির্ম্মাণ হয় না, কাজেই তাঁহারা বাধ্য হইয়া হাতীবাগানে বাটী-নির্ম্মাণের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায় লইয়া ঢাকায় অভিনয় করিতে গমন করেন। এই সময় বিনোদিনী ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া যাওয়ায় তারাসুন্দরীরও থিয়েটারের সহিত সমুদয় সংশ্রব রহিত হয়।

১২৯৫ সালে যখন ষ্টার থিয়েটারের বাটী নির্ম্মাণ হইবার পর ষ্টার সম্প্রদায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের নূতন বাটীতে গিরিশচন্দ্রের নসীরাম নাটকের অভিনয় করিবার জন্য মহোৎসাহে মহালা দিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় সুবিখ্যাত অভিনেতা ৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আগ্রহে শ্রীমতী তারাসুন্দরী আবার ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করে। শ্রীমতী তারাসুন্দরীর মাতা প্রথমে কন্যাকে থিয়েটারে পাঠাইতে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু শ্রীমতী বিনোদিনী মধ্যবর্ত্তিনী থাকায় তাঁহার সে আপত্তি টেকে না। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুবিখ্যাত অভিনেতা ৺ অঘোরনাথ পাঠক মহাশয় তারাদের বাটীতে গমন করেন এবং তারার হাত ধরিয়া লইয়া থিয়েটারে

উপস্থিত হন। তখন তারার বয়স নয় বৎসর মাত্র। সেই নয় বৎসরের বালিকা প্রথম যে দিন ৺ অঘোরনাথ পাঠক মহাশয়ের সহিত ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই তাহার হাবভাব কথাবার্ত্তা শুনিয়া ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনেকেই বলাবলি করিয়াছিলেন, 'কালে এই মেয়েটী একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী হইবে।' প্রথম পত্রই ভাবি বৃক্ষের পরিচায়ক,—ভবিষ্যতে যে বড় হইবে গোড়ায়ই তাহার সূচনা আরম্ভ হয়।

নূতন ষ্টার থিয়েটারে ৺ অমৃতলাল মিত্র মহাশয় শিক্ষক ছিলেন। তিনিই অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। অভিনেত্রী জীবনে তিনিই তারার প্রথম শিক্ষক বা গুরু। নসীরাম নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে ভীল বালকের একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা প্রদান করা হয়। এই ভূমিকাটী নিতান্ত ক্ষুদ্র, কথাবার্ত্তাও অতি অল্প। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই ভূমিকাটী ৺অমৃতলাল মিত্রের নিকট শিক্ষা লাভ করে। অভিনেত্রী জীবনে এই ভূমিকলাভই শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সর্ব্ব প্রথম। নূতন থিয়েটারে আসিয়া নূতন ভূমিকা পাইয়া তারার আনন্দের আর সীমা ছিল না। সে প্রাণের আগ্রহের সহিত এই ভূমিকাটী কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ করিল ও ৺ অমৃতলাল মিত্রের শিক্ষা অনুযায়ী আবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১২৯৫ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ মহাসমারোহে ষ্টার থিয়েটারে নসীরামের অভিনয় হইল। সুবিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ এই নাটকের ভূমিকাগুলি অভিনয় করিয়াছিলেন। কাজেই অভিনয়ের সুখ্যাতিতে সমস্ত কলিকাতা ভরিয়া গেল। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে একবাক্যে স্বীকার করিতে হইল যে শ্রীমতী তারাসুন্দরী প্রথম ভূমিকা গ্রহণ

করিয়া যেরূপ অভিনয় করিয়াছে, সেরূপ যে একটী নবম বর্ষীয়া নবীনা বালিকা নির্দ্দোষ, সুন্দর অভিনয় করিতে পারিবে তাহা থিয়েটারের কেহই আশা করিতে পারেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস স্বর্ণলতা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন, এবং সরলা নামে সেই নাটকখানি মহা-সমারোহে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই পুস্তকে তারাসুন্দরীকে শশি-ভূষণের কন্যা কামিনীর ভূমিকা প্রথমে প্রদান করা হয় এবং সুখদা নামে আর একটি বালিকাকে বিধুভূষণের পুত্র গোপালের ভূমিকা দেওয়া হয়। কিন্তু মহালার সময় ৺অমৃতলাল মিত্র মহাশয় দেখিলেন, সুখদা অপেক্ষা তারা অনেক দক্ষ। তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া শেষে ঐ দুই বালিকার পরস্পরের ভূমিকা দুইটী পরস্পরের মধ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। ফলে সরলায় শ্রীমতী তারাসুন্দরী গোপালের ভূমিকার অভিনয় করে। যদিও এই ভূমিকায় বিশ্লেষণের বিশেষ কিছুই ছিল না তথাপি শ্রীমতী তারার অভিনয় বড়ই মধুর ও স্বাভাবিক হইয়াছিল।

১২৯৫ সালের শেষ ভাগে ৺গোপাললাল শীলের থিয়েটার করিবার সখ মিটিয়া যায়। তিনি তাঁহার থিয়েটারবাটী ভাড়া দিয়া থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। সেই সময় গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটার ছাড়িয়া আবার আসিয়া ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। গিরিশচন্দ্র ষ্টার থিয়েটারে আসিতেছেন এই কথাটা লইয়া ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায়ের ভিতর বেশ একটু সাড়া পড়িয়া যায়। সকলের মুখেই এক কথা—'গিরিশ বাবু আবার আমাদের থিয়েটারে যোগদান করিতেছেন।' শ্রীমতী তারা-

সুন্দরী যদিও তখন নিতান্ত বালিকা, তথাপি থিয়েটারে যোগদান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গিরিশচন্দ্রের নাম সে শুনিয়াছিল এবং তিনি যে কে তাহাও জানিয়াছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্রের স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। গিরিশচন্দ্র ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিবার পর বালিকাসুলভ কৌতূহলের জন্যই হউক অথবা অন্য কোনও কারণেই হউক গিরিশচন্দ্রের স্বরূপ মূর্ত্তিটী দেখিবার জন্য তাহার বড় একটা আগ্রহ জন্মিয়াছিল। সে একদিন থিয়েটারে আসিয়া গিরিশবাবু যেখানে বসেন তাহার এক পার্শ্বে যাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে আসিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিত্র সম্মুখে প্রণাম করিয়া চাহিয়া দেখেন, একটী বালিকা এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। বালিকাকে নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কেরে?"

শ্রীমতী তারাসুন্দরী গিরিশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সহসা গিরিশচন্দ্রের এই প্রশ্নে, সে মাথাটা একটু নীচু করিল এবং সানন্দে তখনই উত্তর দিল, "আমি তারা।"

গিরিশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই বুঝি গোপাল সাজিস্?

শ্রীমতী তারাসুন্দরী মৃদু হাসিয়া তাহার ঘাড়টী একটু নাড়িল। নিকটেই ৺অমৃতলাল মিত্র মহাশয় বসিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র তারার মস্তকে হাত দিয়া অমৃতলালকে বলিলেন, "অমৃত, এই বালিকাকে যত্ন করিস্, ইহার কিছু হবে।"

তারার জীবনে গিরিশচন্দ্রের সেই প্রথম আশীর্ব্বাদ লাভ। গিরিশ-

চন্দ্রের আশীর্ব্বাদ কথন কি বিফল হইতে পারে! সেই হইতে শ্রীমতী তারাসুন্দরী দিন দিন উন্নতির সোপানে উঠিতে আরম্ভ করিল। গিরিশচন্দ্রের এমনই একটা ক্ষমতা ছিল যে তিনি কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দেখিলেই বলিয়া দিতে পারিতেন, ভবিষ্যতে কাহার কি হইবে। তিনি অতি বালিকাকালে যাঁহাদের দেখিয়া বলিয়াছিলেন ইহাদের কিছু হইতে পারে তাহারাই কেবল অভিনেত্রী নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে।

ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিয়া গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল নাটক রচনা করেন। ষ্টার থিয়েটারে মহা সমারোহে উক্ত নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী যাদবের ভূমিকার অভিনয় করে। এই ভূমিকাটী স্বয়ং গিরিশচন্দ্র তাহাকে শিক্ষা প্রদান করেন। এই ভূমিকার অভিনয় শ্রীমতী তারাসুন্দরী অতি চমৎকার করিয়াছিল। "কাকা বাবু, একটু জল দাও" এই উক্তিটী এত সুন্দর হইয়াছিল যে দর্শকবৃন্দ কিছুতেই চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারেন নাই। এইরূপ বালকের ভূমিকা অভিনয়ের জন্য সে সময় যে সকল বালিকা শিক্ষিত হইতেছিল তাহাদের সকলের মধ্যেই শ্রীমতী তারাসুন্দরী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরী ক্ষুদ্র বালকের ভূমিকাই এতদিন পর্য্যন্ত অভিনয় করিয়া আসিতেছিলেন। অতঃপর সে একটী বালিকার ভূমিকা লাভ করিল। ১২৯৬ সালের ২৪শে ভাদ্র গিরিশচন্দ্রের "হারানিধি" নাটক মহা সমারোহে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে হেমাঙ্গিনীর ভূমিকা প্রদান করা হয়। হেমাঙ্গিনী বড় লোকের সোহাগিনী কন্যা। সে কালের বড় লোকের আদুরে মেয়েরা বেশ একটু এচোড়েই পাকিয়া উঠিত। হেমাঙ্গিনীও

পিতার অপরিমিত আদরে ও সোহাগে জ্যেঠামীতে পূর্ণ পরিপষ্ট হইয়াছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই ভূমিকাটী উপযুক্ত শিক্ষকের সোত্তম শিক্ষায় এতই সুন্দর, এতই স্বাভাবিক অভিনয় করিয়াছিল, যে হেমাঙ্গিনীর ভূমিকা অভিনয় করিবার পর হইতেই সে যে একজন প্রকৃত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

এই হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় অভিনেত্রীকে গানও গাইতে হইত, কিন্তু শ্রীমতী তারাসুন্দরী গান গাইতে একেবারেই জানিত না। গানে তাহার অনেক স্থলেই ভুল হইত। কাজেই তাহাতে অভিনয়ের অনেক অসুবিধা হইতে লাগিল। তখন ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ শ্রীমতী তারা-সুন্দরীকে গান শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন ৺রামতারণ সান্যাল। একদিন নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় রামতারণ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"রামতারণ বাবু, এই মেয়েটীকে একটু গান গাইতে শিখাইতে হইবে।"

রামতারণ বাবু সেই দিন হইতে তারাসুন্দরীকে গান শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। রামতারণবাবুর চেষ্টায় ও যত্নে শ্রীমতী তারাসুন্দরী অল্প অল্প গান গাইতে শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। এই সময় ষ্টার থিয়েটারের নৃত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাহাকে কিছু কিছু নৃত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১২৯৭ সালের ১১ই শ্রাবণ গিরিশচন্দ্রের চণ্ড নাটকের ষ্টার থিয়েটারে মহা-সমারোহে অভিনয় হয়। এই নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী মুকুলজীর ভূমিকার অভিনয় করে। এই ভূমিকাটীও তাহার দ্বারা বেশ সুচারুরূপেই অভিনীত হইয়াছিল। এই সময়ে ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় ৺নবীনচন্দ্রের পলাসীর যুদ্ধ

অভিনয় করে। এই পুস্তকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী ব্রিটেনিয়ার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং মধুর ভাবাভিনয়ে সমস্ত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

এই সময় সহসা একটী সুবিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মৃত্যু হওয়ায় ষ্টার থিয়েটারের অনেক বই কাণা হইয়া যায়। সুবিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (কাপ্তেন বেল) সহসা দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর অল্প কয়েক দিন পরেই সুবিখ্যাত অভিনেত্রী কিরণবালা পরলোকে গমন করে। উপর্য্যুপরি এইরূপ দুইটী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মৃত্যু হওয়ায় ষ্টার থিয়েটারকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই দুই জন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মৃত্যুতে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ থিয়েটাব দুই মাস কাল বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দুই মাস পরে আবার যখন ষ্টার থিয়েটার খোলা হয় তখন গিরিশচন্দ্রের "মলিনা বিকাশ" নামক গীতিনাট্য লইয়া তাঁহারা থিয়েটারের দরজা উন্মুক্ত করেন। এই গীতিনাট্যে শ্রীমতী তারাসুন্দরীর কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু সহসা কুসুম নামে একটী সখী থিয়েটার ছাড়িয়া দেওয়ায় তাহার স্থানে শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে সখী সাজিতে হইয়াছিল। থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক অভিনেত্রীকেই প্রথমে সখী সাজিতে হয়, কিন্তু শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে কখনও সখী সাজিতে হয় নাই। সে থিয়েটারে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে ভূমিকা পাইয়াছিল। এত দিন পরে সহসা নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায় শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে সখী সাজিতে হইল। যদি এইরূপ সহসা কুসুম থিয়েটার ছাড়িয়া না দিত তাহা হইলে হয়তো শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে কোন দিনই সখী সাজিতে হইত না।

যখন ষ্টার থিয়েটারে মলিনা বিকাশের অভিনয় চলিতেছিল, সেই সময় মিনার্ভা থিয়েটারের পত্তন হয়। মিনার্ভা থিয়েটার পত্তন হইবার পর

প্রমদা প্রভৃতি কয়েকজন বড় বড় সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দান করে। এই সময় অভিনেত্রীর অভাববশতঃ শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে তাজ্জব ব্যাপারে "বিবি", তরুবালাতে 'তরুবালা' ও অপর কয়েকটী ভূমিকার অভিনয় করিতে হইয়াছিল। সুবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী হিঙ্গনবালা (হেনা) তরুবালার ভূমিকার অভিনয় করিত। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই ভূমিকাটি পাইয়া হেনা যে ভাবে অভিনয় করিত সে ভাবে অভিনয় না করিয়া স্থানে স্থানে এক অভিনব মনোহর ভাবের অবতারণা করিয়া অভিনয় করিয়াছিল। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় তারার তরুবালার অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "হেনার অপেক্ষা তারার তরুবালার ভূমিকার অভিনয় অনেক ভাল হইয়াছে।"

এই সময় তারাসুন্দরীকে লয়লামজনু গীতিনাট্যে 'মুন্নার' ভূমিকা, নরমেধযজ্ঞে 'মণিদত্তের' ভূমিকা, বেনজীরদরেমুনির গীতিনাট্যে 'ফিরোজার' ভূমিকা, এবং বনবীর নাটকে বনবীরের ভ্রাতা 'উদয়সিংহের' ভূমিকার অভিনয় করিতে হইয়াছিল। এই সকল ভূমিকা তাহার পূর্ব্বে যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছিল, শ্রীমতী তারাসুন্দরীর অভিনয় তাহাদের অপেক্ষা হীন তো হয়ই নাই, বরং অনেক হিসাবে শ্রেষ্ঠই হইয়াছিল। যে ভূমিকা তারাকে প্রদান করা হয় তাহাই উত্তম হয় দেখিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং থিয়েটারের আচার্য্যগণ তাহার যাহাতে উন্নতি হয় সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। যাহা হউক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা যে একজন বিশেষ কাজের লোক হইয়াছিল তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

থিয়েটার সম্প্রদায়ের পরিচালনা যে কি কঠিন ব্যাপার যাহারা কোন দিন

উহা করেন নাই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মন যোগাইয়া কিছুতেই চলিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা ব্যবসায় করিতে বসিয়াছেন, সকল অভিনেতা অভিনেত্রীর অযথা আবদার তাঁহারা কাহাতক রক্ষা করিতে পারেন, অথচ পাণ হইতে একটু চুণ খসিলেই সর্ব্বনাশ ব্যাপার! অমনই একজন অভিনেতা দল পাকাইয়া আরও দুই চারি জনকে সঙ্গে লইয়া সহসা একদিন, বলা নয় ক'হা নয়, থিয়েটার ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের যে কিরূপ বিপদ্-গ্রস্ত হইতে হয় তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। যখন ষ্টার থিয়েটারে তরুবালা ও তাজ্জব-ব্যাপারের অভিনয় মহাসমারোহে চলিতেছিল, সেই সময় সহসা একদিন ৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তী ও ৺প্রবোধচন্দ্র ঘোষ কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী ভাঙ্গাইয়া লইয়া ষ্টার থিয়েটারের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা থিয়েটার ভাড়া লইয়া সিটি থিয়েটার নাম দিয়া একটী নূতন সম্প্রদায় চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

সহসা এইরূপ কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছাড়িয়া যাওয়ায় ষ্টার-থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বিশেষ বিপদ্-গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের থিয়েটারে আর একজনও প্রবীণ সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী ছিল না। নলদময়ন্তী, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব প্রভৃতি নাটক তখন ষ্টারে মহাসমারোহে অভিনীত হইতে-ছিল। কিন্তু ইহাদের নায়িকা সাজিবে কে? থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অনেক পরামর্শের পর স্থির করিলেন তারাকেই এই সকল পুস্তকের নায়িকার ভূমিকা প্রদান করিতে হইবে, নতুবা এই নাটকগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় এই নাটকগুলির নায়িকার ভূমিকা

তারাকে শিক্ষা দিতে বলিলেন। পরদিন শ্রীমতী তারাসুন্দরী থিয়েটারে আসিবা-মাত্র এই ভূমিকাগুলি তাহাকে প্রদান করা হইল। তখন শ্রীমতী তারাসুন্দরীর বয়স কেবলমাত্র তের বৎসর। ত্রয়োদশ বৎসরের একটী বালিকাকে চৈতন্য-লীলায় চৈতন্যের ন্যায় কঠিন ভূমিকা কর্তৃপক্ষীয়গণ কখনই দিতে পারিতেন না বা সাহস করিতেন না, কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তাঁহারা চৈতন্য, দময়ন্তী ও গোপার ভূমিকা তারাসুন্দরীকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অমৃতবাবু দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া এই ভূমিকাগুলি শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে শিখাইয়া দিলেন। শ্রীমতী তারাসুন্দরী গুরুর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। এই তিনটী ভূমিকা পূর্ব্বে সুবিখ্যাত অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও শ্রীমতী তারার অভিনয় একেবারে নিন্দার হয় নাই। তের বৎসরের বালিকার নিকট হইতে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যাহা আশা করিয়াছিলেন অভিনয় তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোক গমন করেন। এই ঘটনা লইয়া নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় একখানি সময়োপযোগী শোকনাটিকা রচনা করেন। ইহার ভিতরে "বঙ্গভাষার" ভূমিকাটীই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ছিল, এবং সেই ভূমিকায় গানও অনেকগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই ভূমিকাটী কাহাকে প্রদান করা যায় তাহা লইয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ভিতর অনেক আলোচনা হয়। অমৃত বাবু এই ভূমিকাটী শ্রীমতী তারাসুন্দরীকেই দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু থিয়েটারের অন্যান্য সকলেই তাহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। তখন সঙ্গীতাচার্য্য রামতারণ বাবু বলিলেন, "তোমরা এত ভাবিতেছ কেন?

বঙ্গভাষার ভূমিকায় যে কয়টী গান আছে তাহাতে এমন আমি সুর দিব যে তারার গলায় বেশ সুন্দর খাপ খাইবে।"

রামতারণ বাবুর এই কথায় এবং তাঁহার বিশেষ আগ্রহে শেযে বঙ্গভাষার ভূমিকাটী তারাসুন্দরীকেই প্রদান করা হইয়াছিল। এই ভূমিকাটী শ্রীমতী তারাসুন্দরী এত ভাবমধুর করিয়া অভিনয় করিয়াছিল যে সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এই শোকনাটিকার অভিনয় রজনীতে পণ্ডিত প্রধান মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তারার অভিনয় দেখিয়া এমনই প্রীত হইয়াছিলেন যে স্বয়ং সংবাদ পত্রে শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী তারাসুন্দরী যে এমন সুন্দর গান গাইতে পারিবে তাহা থিয়েটারের কেহই আশা করিতে পারেন নাই। ৺অমৃতলাল মিত্র মহাশয় এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি জেদ্ করিয়া গিরিশচন্দ্রের ধ্রুবচরিত্রের পুনরভিনয় করান এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে ধ্রুবের ভূমিকা প্রদান করিয়া নিজে তাবাকে দিনরাত পরিশ্রম করিয়া আগাগোড়া শিক্ষা প্রদান করেন। ধ্রুবের ভুমিকা অভিনয় করিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সুখ্যাতি শত মুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ইহার কিছুদিন পরে ষ্টার থিয়েটারে "কৃষ্ণবিলাস" গীতিনাট্য হিন্দীতে অভিনীত হয়। এই পুস্তকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী রাধিকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই ভূমিকার অভিনয় কালে শ্রীমতী তারাসুন্দরী হিন্দী কথা-বার্ত্তা ও গানের এমন সুন্দর আবৃত্তি করে যে দর্শকগণ তাঁহাকে হিন্দুস্থানী মহিলা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। রাধিকার প্রেমোন্মাদ ভাবটি সে এত সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছিল যে তাহা একেবারে সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর ক্রমে যতই তাহার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল

ততই সে জটিল ও কঠোর ভূমিকার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর সে বিজয়বসন্ত নাটকে বিজয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শক গণকে অবিরত কাঁদাইয়াছিল। বিজয়ের ভূমিকার পর, "অন্নদা মঙ্গলে" গৌরী, বহুৎ আচ্ছায় "রেবেকা," বাবুতে "মহিলা" প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করে। ইতি মধ্যে আর একটী ভূমিকা অভিনয় করিয়া সে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করে। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর বিবাহবিভ্রাট প্রহসন এই সময় ষ্টার থিয়েটারে মহাসমারোহে পুনরভিনয় হয়। এই বিবাহবিভ্রাট প্রহসনে শ্রীমতী তারাসুন্দরী বিলাসিনী কারফরমার ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ভূমিকাটী তাহার নাকি একেবারে নিখুঁত অভিনয় হইয়াছিল। থিয়েটারের প্রত্যেক দর্শক এবং সম্প্রদায়ের অনেক লোক এই ভূমিকার অভিনয়ের শ্রীমতী তারাসুন্দরীর বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিল। যাহা হউক এইভাবে ক্রমে ক্রমে শ্রীমতী তারাসুন্দরী নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কলিকাতার সমস্ত থিয়েটার সম্প্রদায়ের প্রায়ই অনেকে বলাবলি করিতেন, "তারার উপর ভগবানের বেশ একটু করুণা আছে।"

যে পুস্তকের অভিনয় করিয়া ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় সর্ব্ববাদিসম্মত কলিকাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ থিয়েটার নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন এতদিন পরে সেই পুস্তকের মহালা আরম্ভ হইল। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অমৃতবাবু বিশেষ হিসাব করিয়া ভূমিকাগুলি বণ্টন করিলেন। যাহার দ্বারা যে ভূমিকাটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হওয়া সম্ভব তিনি তাহাকেই সেই ভূমিকাটী প্রদান করিলেন।

মহালা রীতিমত চলিতে লাগিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে শৈবলিনীর ভূমিকা প্রদান করা হইল। অমৃতবাবু নিজে তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অমৃতবাবু একদিন কথায় কথায় তারাকে বলিয়াছিলেন, "এই ভূমিকাটীর অভিনয়ের উপর তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এই ভূমিকাটী যদি তুমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করিতে পার তাহা হইলে আর তোমার মার নাই।"

শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই ভূমিকাটী প্রাণপণ যত্নে শিখিতে লাগিল। সময়ে ষ্টার থিয়েটারে মহাসমারোহে চন্দ্রশেখরের অভিনয় হইল। এক-বাক্যে সমস্ত দর্শকগণকেই স্বীকার করিতে হইল এমন অভিনয় এক্ষণে আর আমরা কখনও দেখি নাই। শৈবলিনী, দলনী, ফষ্টর, চন্দ্রশেখর, সুন্দরী, গুর্গন, শ্রীনাথ প্রভৃতি ভূমিকাকয়টীরই বিশেষ সুখ্যাতি হইল। কিন্তু শৈবলিনীর সুখ্যাতিতে সমস্ত বঙ্গদেশ ভরিয়া গেল। সকলের মুখেই এক কথা,—'এতদিন পরে আমরা বঙ্কিম চন্দ্রের জীবন্ত শৈবলিনী দেখিয়া আসিলাম।' শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই শৈবলিনীর ভূমিকাটী এমন সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে তাহাতে দোষ ধরিবার আর কিছুই ছিল না। অনুতাপের অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্তের নিখুঁত ভাবাবিনয় শ্রীমতী তারা সুন্দরী কল্পনা-বলে এমনই সজীব দেখাইয়াছিল যে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকেও পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল।

পোনের ষোল বৎসর বয়সই অভিনেত্রীর জীবনের বড়ই বিষম কাল। এই সময় শত সহস্র প্রবল প্রলোভন চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া যুবতী উদীয়মানা অভিনেত্রীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। অতিসামান্য অভিনেত্রীই এই প্রলোভনের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে। শ্রীমতী তারাসুন্দরীকেও

এই প্রচণ্ড প্রলোভনে পড়িয়া হৃদয়ের দুর্ব্বলতাবশতঃ এই সময় হইতে কয়েক বৎসর থিয়েটারের সহিত সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহাই বঙ্গ রঙ্গালয়ের চিরন্তন অভিশাপ। কত যত্নে, জীবনান্ত পরিশ্রমকর শিক্ষায় যেই একটি অভিনেত্রী কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ পূর্ব্বক প্রকৃত অভিনয়কুশলা হইয়া উঠিল, অমনই কোনও বিলাসী ধনপতির দুর্দম প্রলোভনে তাহাকে গ্রাস করিয়া বসিল। এতদিনের সব শিক্ষা ও দীক্ষা একদিনের প্রচণ্ড প্রলোভনানলে ভস্মসাৎ হইয়া গেল! এই জন্যই বোধ হয় এখন আর নূতন অভিনেত্রী রঙ্গালয়ে শিক্ষিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানারূপ আছে। সে যাহা হউক মাত্র তিন রাত্রি শৈবলিনীর ভূমিকা অভিনয় করিবার পর সহসা শ্রীমতী তারাসুন্দরী থিয়েটার পরিত্যাগ করিল। এই আকস্মিক ব্যাপারে ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং তারাসুন্দরীর এই অকৃতজ্ঞ ব্যবহারের জন্য অমৃতবাবু বিশেষ মনোব্যথা পাইলেন। সে যাহা হউক ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কোন ক্রমে এই দারুণ বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া মান রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীমতী তারাসুন্দরী তিনরাত্রমাত্র ষ্টার থিয়েটারে শৈবলিনীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া যে সময় ষ্টার থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করে, সেই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে মহাসমরোহে করমেতি বাই নাটকের অভিনয় হইতেছিল। তখন মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। এদিকে সহসা শ্রীমতী তারাসুন্দরী ষ্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করায় ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যেমন বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন, ওদিকে অর্দ্ধেন্দুশেখর সহসা মিনার্ভা থিয়েটার

ছাড়িয়া যাওয়ায় গিরিশচন্দ্রও সেইরূপ মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি একেই অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্থান পূরণ করিতে পারিতেছিলেন না, আবার সেই সময় কিছুদিনের জন্য শ্রীমতী তিনকড়িকেও থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। করমেতিবাইএ শ্রীমতী তিনকড়িই করমেতির ভূমিকা অভিনয় করিতেছিল। সহসা সেও থিয়েটার ছাড়িয়া দেওয়ায় গিরিশচন্দ্র একেবারে অন্ধকার দেখিলেন। এখন উপায়? করমেতির ন্যায় ভূমিকা যে সে অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনয় করান কিছুতেই সম্ভবপর নয়। গিরিশচন্দ্রকে নিতান্ত অনুপায় হইয়া শেষে তারাসুন্দরীরই শরণ লইতে হইল। কেবল মাত্র দুই রাত্রির জন্য করমেতি বাই-এর ভূমিকা অভিনয় করিয়া দিয়া যাইবার জন্য শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে তিনি অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। গিরিশচন্দ্রের অনুরোধ উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা কোন দিনই কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ছিল না। শ্রীমতী তারাসুন্দরী দুই রাত্রি করমেতি বাইএর ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য মিনার্ভা থিয়েটারে আসিল। কেবল মাত্র তিন দিন শিক্ষার পরই তাহাকে সেই প্রকাণ্ড ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইল। যে ভূমিকা অভিনেত্রী-সম্রাজ্ঞী তিনকড়ি অভিনয় করিয়া গিয়াছে সে ভূমিকা অভিনয় করিয়া সুনাম লাভ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু মাত্র তিন দিনের শিক্ষায়ই শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই ভূমিকা অভিনয়ের সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র শ্রীমতী তারাসুন্দরীর পৃষ্ঠে সাদরে চপেটাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "বেটি, আমার মুখ রক্ষা করিয়াছিস্। আমার আশীর্ব্বাদে কালে বঙ্গনাট্যশালায় তুই একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হবি।"

সেই দুই রাত্রি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করিবার পর শ্রীমতী তারাসুন্দরী বহুদিন আর কোন থিয়েটারে কোনও অভিনয় করে নাই। তাহার পর অমরেন্দ্রনাথের পরিচালনে যখন ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাবের উদ্বোধন হয়, সেই সময় শ্রীমতী তারাসুন্দরী সেই সম্প্রদায়ে যোগদান করে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব, শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ৺প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অভিনেতাকে লইয়া অমরেন্দ্রনাথ এই সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। প্রথম এমারেল্ড থিয়েটারে এই সম্প্রদায় পলাশীর যুদ্ধের অভিনয় করে। শ্রীমতী তারাসুন্দরী পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটেনিয়া ও বেগমের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল। তাহার পর এই সম্প্রদায় আবার যখন মিনার্ভা থিয়েটারে পলাশীর যুদ্ধ ও বেল্লিক বাজারের অভিনয় করে, তখনও শ্রীমতী তারাসুন্দরী পলাশীর যুদ্ধে আবার বেগম ও ব্রিটেনিয়ার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং বেল্লিক বাজারে ললিতের ভূমিকা অভিনয় করে। এই ললিতের ভূমিকাটী অভিনয় করিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরী বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল।

ইহার পর আর একদিন এই সম্প্রদায় বেঙ্গল থিয়েটারে বিষাদ নাটকের অভিনয় করে। এই বিষাদ নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী রাণী সরস্বতী বা বিষাদের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরীর এই ভূমিকাটীর অভিনয় এত সুন্দর হইয়াছিল যে তাহা লিখিয়া বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। বেঙ্গল থিয়েটারে যে দিন এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিষাদ নাটকের অভিনয় হয় সে দিন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র কবিচূড়ামণি নবীনচন্দ্রের সম্মুখে শ্রীমতী তারাসুন্দরীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন,—"আজ আমার বিষাদ লেখা সার্থক হইল।"

ইহার কিছুদিন পরে যখন সিটি থিয়েটার সম্প্রদায় এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করেন সেই সময় শ্রীমতী তারাসুন্দরী কয়েক রাত্রের জন্য সিটি থিয়েটারে অভিনয় করে। ৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তী সিটি থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহারই আগ্রহ ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এই সম্প্রদায়ে শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে যোগদান করিতে হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী নামক উপন্যাসখানি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে দেবীর ভূমিকা প্রদান করা হয়। যে সময় সিটি থিয়েটার সম্প্রদায় এমারেল্ড থিয়েটারে দেবীচৌধুরাণীর অভিনয় আরম্ভ করে সেই সময় বেঙ্গল থিয়েটারেও দেবীচৌধুরাণীর অভিনয় হইতেছিল। বেঙ্গল থিয়েটারে যে অভিনেত্রী দেবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল সেও একজন সুবিখ্যাত অভিনেত্রী। কিন্তু প্রতিযোগিতায় তারাসুন্দরীই শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবীর ভূমিকা এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে এমারেল্ড থিয়েটারে "দেবীর ভূমিকা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।" বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী তারাসুন্দরী যে কয়টী অভিনয় করিয়াছে, তাহা একেবারে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। আজি পর্য্যন্ত কোন অভিনেত্রীই সে সব ভূমিকার অভিনয়ে শ্রীমতী তারাসুন্দরীর নিকটেও পৌঁছাইতে পারে নাই। ঈশ্বর দত্ত যে অনন্যপ্রতিমা প্রতিভা লইয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা এক শৈবলিনীর অভিনয়েই সমস্ত বাঙ্গালা ময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরী যে কত বড় প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তাহা সে এই শৈবলিনীর অভিনয়েই সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিল।

তারাসুন্দরী

ইহার কিছুদিন পরে অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধে শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে ক্লাসিক থিয়েটারে যোগ দান করিতে হয়। 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'বেল্লিক বাজার'—এই দুইখানি পুস্তকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী পূর্ব্বে যে দুইটী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, ক্লাসিকের উদ্বোধনের দিনেও সেই দুইটী ভূমিকা গ্রহণ করে। তাহার পর ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য অমরেন্দ্রনাথ "হরিরাজ" নাটক রচনা করেন। এই নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে বরুণার ভূমিকা প্রদান করা হয়। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই ভূমিকাটী কয়েকরাত্রি অভিনয় করিবার পর, তাহাকে আবার এই নাটকে শ্রীলেখার ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ের বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী ছোট রাণী শ্রীলেখার ভূমিকা অভিনয় করিতেছিল। সহসা একদিন, অভিনয়ের মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে, সে ক্লাসিক থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করে। তখন বাধ্য হইয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে এই ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীলেখার ভূমিকার অভিনয় শ্রীমতী তারাসুন্দরীর এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। সে এই ভূমিকাটী অভিনয়াচার্য্যের বিনা সাহায্যে নিজেই দুই দিনের ভিতর আয়ত্ত করিয়াছিল এবং অভিনয়কালে এক অপূর্ব্ব অভিনব ছবি দর্শকগণকে দেখাইয়াছিল। যাঁহারা শ্রীমতী তারাসুন্দরীর এই শ্রীলেখার ভূমিকা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন এই ভূমিকার অভিনয় শ্রীমতী তারাসুন্দরী কত সুন্দর করিয়াছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরীর পর এই শ্রীলেখার ভূমিকা অনেক বড় বড় অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীমতী তারার সমকক্ষ কেহই হইতে পারে নাই। তারার এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়া সুবিখ্যাত অভিনেতা ৺মহেন্দ্রলাল বসু মহাশয় তারাকে বলিয়াছিলেন,

"সাবাস, বলিহারী যাই! একা তোমায় পাইলেই একটা দল অনায়াসেই চালাইতে পারা যায়।"

ইহার পর ক্লাসিকথিয়েটারে দেবী-চৌধুরাণীর অভিনয় হয়। শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবীর ভূমিকা গ্রহণ করে। কয়েক রাত্রি দেবীর ভূমিকা অভিনয় করিবার পর একটী অতি সামান্য কারণে শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সহিত অমরেন্দ্রনাথের মন কসাকসি আরম্ভ হয়। শ্রীমতী তারাসুন্দরী ক্লাসিকের সংশ্রব অবিলম্বে পরিত্যাগ করে।

ক্লাসিক থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া সামান্য কিছুদিন শ্রীমতী তারাসুন্দরী কোন থিয়েটারেই ছিল না। তাহার পর আবার সে ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করে। সে যে দিন ষ্টার থিয়েটারে আবার যোগদান করে তাহার পরদিনই ষ্টার থিয়েটারে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর গ্রাম্য-বিভ্রাট নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। সময় না থাকায় এই পুস্তকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী বিশেষ কোন ভূমিকা পায় না। এই পুস্তকে সে সামান্য একজন প্রতিবেশিনীর ভূমিকা লইয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চে আবার বহুদিন পরে অবতীর্ণ হয়। ষ্টার থিয়েটার হইতেই শ্রীমতী তারাসুন্দরীর অভিনেত্রী-জীবনের আরম্ভ, এইখানেই তাঁহার অভিনয় শিক্ষা ও যশোলাভের প্রারম্ভ। বহুদিন পরে আবার সেই ষ্টারে যে দিন সে যোগদান করিয়াছিল, সেদিন তাঁহার সমস্ত প্রাণটা একটা নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

গ্রাম্য বিভ্রাট অভিনয় হইবার কিছুদিন পরে ষ্টার থিয়েটারে "কিরণ-শশী" নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে অপর্ণার ভূমিকা প্রদান করা হয়। এই ভূমিকা অভিনয় করিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরী

যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। ষ্টারে কিরণশশী নাটকের অভিনয় কালে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের "বিরহ" রঙ্গনাট্যের অভিনয় হয়। বিরহই দ্বিজেন্দ্র-লালের সাধারণ থিয়েটারে অভিনীত প্রথম পুস্তক। এই ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্যখানির অভিনয় দেখিয়াই দর্শকবৃন্দ দ্বিজেন্দ্রলালকে একজন সুদক্ষ নাট্যকার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। এই বিরহ রঙ্গনাট্যে শ্রীমতী তারাসুন্দরী একটী প্রতিবেশিনীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই ভূমিকাটি অতি ক্ষুদ্র হইলেও শ্রীমতী তারাসুন্দরী তাহাতে বেশ একটু বিশেষত্ব দেখাইয়াছিল।

ষ্টার থিয়েটারে তাহার পর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। এই নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী শৈব্যার ভূমিকা গ্রহণ করে। ষ্টার থিয়েটারে যে রাত্রিতে হরিশ্চন্দ্রের প্রথম অভিনয় হয় সে রাত্রে আমরা এই হরিশ্চন্দ্র নাটক দেখিতে গিয়াছিলাম। এই নাটকে ৺অমৃতলাল মিত্র হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর শ্রীমতী তারাসুন্দরী হইয়াছিল শৈব্যা। গুরু ও শিষ্যার এই অপূর্ব্ব সমাবেশে হরিশ্চন্দ্র নাটকের মূর্ত্তি একেবারে অন্যরূপ হইয়া গিয়াছিল। শ্মশানদৃশ্যে চণ্ডালবেশে হরিশ্চন্দ্র ও মৃত পুত্র কোলে শৈব্যার সেই অপূর্ব্ব অভিনয় আজিও আমরা ভুলিতে পারি নাই। সে যা অভিনয় হইয়াছিল তেমনটী বড় একটা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দর্শকবৃন্দ এতই মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে ড্রপ পড়িবার বহুক্ষণ পরে তাঁহারা যে অভিনয় দেখিতে-ছিলেন, স্বরূপ হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা দেখিতেছিলেন না, তাহা উপলব্ধি করিয়া স্বস্ব স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় অতি অল্প মিলনান্ত নাটকই বাঙ্গালা রঙ্গালয়ে দর্শকগণের তাদৃশ প্রাণস্পর্শী অভিনীত হইয়াছে। ইহার পর ষ্টার থিয়েটারে

"বসন্তসেনা" নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকেও শ্রীমতী তারাসুন্দরী নায়িকার অর্থাৎ বসন্তসেনার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। * এই ভূমিকাতেও শ্রীমতী তারাসুন্দরী যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে আবার ষ্টার থিয়েটারে "আদর্শবন্ধু" † নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকেও শ্রীমতী তারাসুন্দরী প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী যে ভূমিকাটী গ্রহণ করিয়াছিল সেই ভূমিকাটীর অভিনয় সে এত সুন্দর করিয়াছিল, যে ইণ্ডিয়ান মিরারের সুপ্রবীণ সম্পাদক তাঁহার অভিনয়ের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

১৩০৪ সালের ৪ঠা পৌষ ষ্টার থিয়েটারে মহাসমারোহে গিরিশচন্দ্রের "মায়াবসান" নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী কালিকান্তের বড় বধূ অর্থাৎ অন্নপূর্ণার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিচিত্র অভিনয়ে দর্শকমণ্ডলীকে মোহিত করিয়া দিয়াছিল। ষ্টার থিয়েটারে মায়াবসান নাটকের অন্নপূর্ণার ভূমিকা কিছুদিন অভিনয় করিবার পর শ্রীমতী তারাসুন্দরী আবার ষ্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করে। পরিশেষে অমরেন্দ্রনাথের বিশেষ জেদাজেদিতে পড়িয়া তাঁহাকে অনেককাল পরে আবার ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করিতে বাধ্য হইতে হয়। দ্বিতীয়বার ক্লাসিক থিয়েটারে আসিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরী "রাম বনবাসে" কৈকেয়ীর ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয় এবং দর্শক-

* সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের ছায়াবলম্বনে বসন্তসেনা বিরচিত হইয়াছিল।

† ইহা দেমন ও পাইসিয়স নামক গ্রীষদেশীয় দুই আদর্শ-বন্ধুর আখ্যান অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল।

মণ্ডলীকে তাহার অসীম শক্তির পরিচয় প্রদান করে। শ্রীমতী তারাসুন্দরী দ্বিতীয়বার যখন ক্লাসিক থিয়েটারে আগমন করে তখন গিরিশচন্দ্রের "মনের মতন" নাটকের মহালা চলিতেছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরী ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করিবামাত্র ইহার নায়িকা গোলেন্দামের ভূমিকা তাহাকেই প্রদান করা হয়। এই গোলেন্দামের ভূমিকা অভিনয় করিয়াও শ্রীমতী তারাসুন্দরী নিজের যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ১৩০৮ সালে ৭ই বৈশাখ ক্লাসিক থিয়েটারে এই মনের মতন নাটকের অভিনয় হয়। প্রথম রাত্রির দর্শকগণ এই গোলেন্দামের ভূমিকার অভিনয় দেখিয়া সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছিলেন, "তারার সত্যই তুলনা হয় না। তারার তুলনা তারা।"

এই সময় বেঙ্গল থিয়েটার ভাড়া লইয়া শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ মৈত্র মহাশয় একটী নূতন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই থিয়েটারের নাম দেন অরোরা থিয়েটার। তিনি ৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তীকে এই দলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। নীলমাধব বাবু অরোরা থিয়েটারের ভার গ্রহণ করিয়া দল সৃষ্টি করিবার জন্য কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী অন্যান্য থিয়েটার হইতে ভাঙ্গাইয়া লইয়া আসেন। তিনি এই সময় অধিক বেতন দিবেন বলিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরীকেও তাঁহার থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। অরোরা থিয়েটারে তখন শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "কাল-পরিণয়" নামে একখানি সামাজিক নাটকের মহালা চলিতেছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরী ক্লাসিক থিয়েটার হইতে অরোরা থিয়েটারে যোগদান করিলে তাঁহাকে এই নাটকে মোক্ষদার ভূমিকা প্রদান করা হয়। এই মোক্ষদার ভূমিকাটি শ্রীমতী তারাসুন্দরী এতদূর সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে কলিকাতার

বিখ্যাত জমিদার ৺অনাথনাথ দেব মহাশয় তাঁহার এই অভিনয় দেখিয়া একখানি স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছিলেন। অরোরা থিয়েটার হইতেই শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সুখ্যাতি একেবারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং তারা যে একজন প্রতিভাময়া সুদক্ষা অভিনেত্রী তাহা সকলে জানিতে পারে।

ইহার কিছুদিন পরে অরোরা থিয়েটারে শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়ের রিজিয়া নাটকের মহালা আরম্ভ হয়। এই সময়ে ৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তী ৺অর্দ্ধেন্দুশেখরকে অরোরা থিয়েটারে শিক্ষকরূপে লইয়া আসেন। ৺অর্দ্ধেন্দু বাবু যখন অরোরা থিয়েটারে যোগদান করেন তখন অরোরা থিয়েটারে রিজিয়া নাটকের পুরা দস্তুর মহালা চলিতেছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই নাটকে রিজিয়ার ভূমিকা মহালা দিতেছিল। সঙ্গীতসমাজের ৺নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রিজিয়ার শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন। কিন্তু মুস্তোফী সাহেব আসিয়া সে শিক্ষা ইংরাজিভাবাপন্ন বলিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে তাহা একেবারে ভুলিয়া যাইতে উপদেশ দেন এবং স্বয়ং আগাগোড়া নূতন করিয়া শিক্ষা প্রদান করেন। মুস্তোফী মহাশয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই ভূমিকাটী এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে সেরূপ অভিনয় আর কোনও অভিনেত্রীর দ্বারা কখনও হইল না। আমাদের মনে হয় শ্রীমতী তারাসুন্দরীর মৃত্যুর পর এ ভূমিকার আর অভিনয় হইবে না।

অরোরা থিয়েটারে থাকিতে শ্রীমতী তারাসুন্দরী আর একটী ভূমিকা মুস্তোফী মহাশয়ের নিকট শিক্ষিত হইয়াছিল। একাদশ বৃহস্পতি প্রহসনে দালাল বালকের ভূমিকাটীও তাঁহার মুস্তোফী মহাশয়ের নিকট শিক্ষা।

একাদশ বৃহস্পতি প্রহসনে দালাল বালকের ভূমিকা অভিনয় করিবার পর অরোরা থিয়েটারের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ইউনিক থিয়েটার নাম ধারণ করে এবং শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ মৈত্র সত্বাধিকারী পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত গিরিমোহন মল্লিক সত্বাধিকারী হন। গিরিমোহন বাবুর আমলে ইউনিক থিয়েটারে "রত্নমালা" নামক একখানি নাটকের অভিনয় হয়। এই নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী মন্দারমালার ভূমিকা গ্রহণ করে ও তাহার বিচিত্র অভিনয়ে দর্শক মণ্ডলীকে একেবারে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিয়া দেয়। ইউনিক থিয়েটারে শ্রীমতী তারাসুন্দরী সামান্য কয়েকমাস মাত্র কাজ করিয়া উহা পরিত্যাগ করে।

এই সময় সুবিখ্যাত হাইকোর্টের উকিল ৺মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম, এ, বি, এল ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে একত্র মিলিত হইয়া মিনার্ভা থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে তাঁহাদের থিয়েটারে লইয়া আসেন। শ্রীমতী তারাসুন্দরী মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিয়া সংসার নামক নাটকে বামার ভূমিকা লইয়া প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়। তাহার পর ক্রমান্বয়ে প্রতাপাদিত্যে কল্যাণী, রাণাপ্রতাপে যোশীবাই, হর-গৌরীতে গৌরী, বলিদানে সরস্বতী, সিরাজদ্দৌলায় জহরা প্রভৃতি ভূমিকা-গুলির অভিনয় করিয়া দর্শকমণ্ডলীর শত সহস্র সাধুবাদ লাভ করে। এই ভূমিকাগুলির নিখুঁত অভিনয় করিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরা যত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল তত প্রশংসা লাভ আর কোন অভিনেত্রীর ভাগ্যে ঘটে নাই।

যখন এই সকল নাটক উপযুক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনীত করাইয়া মিনার্ভা থিয়েটার কলিকাতার সমস্ত থিয়েটারের অগ্রগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই সময় ৺শরৎকুমার রায় গোপাললাল শীলের

এমারেল্ড থিয়েটার ক্রয় করিয়া কোহিনুর থিয়েটার নাম দিয়া একটী নূতন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতার সমস্ত রঙ্গালয়ের যাবতীয় সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী বাছিয়া বাছিয়া তাঁহার থিয়েটারে সমাবেশ করেন। শ্রীমতী তারাসুন্দরীকেও সেই সময় মিনার্ভা ছাড়িয়া কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করিতে হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের চাঁদবিবি নামক নাটক লইয়া এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এই চাঁদবিবি নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে চাঁদবিবির ভূমিকা প্রদান করা হয়। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই ভূমিকাটীর অতি নিখুঁত অভিনয় করিয়াছিল। ইহার পর কোহিনুর থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের শিবাজি নাটকের অভিনয় হয়। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই নাটকে লক্ষ্মীবাইয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। কোহিনুর থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ৺শরৎকুমার রায়ের লোকান্তর হয়, সঙ্গে সঙ্গে কোহিনুরেরও দরজা বন্ধ হইয়া আইসে। এই সময় শ্রীমতী তারাসুন্দরী কোহিনুর থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া বাণী থিয়েটার নামক একটী নব নাট্যসম্প্রদায়ে যোগদান করে। এই বাণী থিয়েটারে যোগদান করিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরী নূতন কোনও ভূমিকার অভিনয় করে নাই। এখানে আসিয়া সে রিজিয়া প্রভৃতি পুরাতন কয়েকটী ভূমিকার অভিনয় করিয়াছিল। বাণী থিয়েটারের অস্তিত্ব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিছুদিন পরেই বাণী থিয়েটার উঠিয়া যায় এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী আবার মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করে। মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরী অশোকে পদ্মাবতী, তপোবলে সুনেত্রা, দুর্গাদাসে কাশ্মিরী বেগম, সাজাহানে জাহানারা, নুরজাহানে নুরজাহান, ও গৃহলক্ষ্মীতে

বিরজা প্রভৃতি ভূমিকাগুলি অভিনয় করিয়া কলাবিদ্যার চরম বিকাশ প্রদর্শন করে।

এই সময় ৺মহেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়েরর সহসা মৃত্যু হওয়ায় কিছুকালের জন্য মিনার্ভা থিয়েটার শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় একাকী পরিচালিত করেন। তাহার পর যখন মহেন্দ্রবাবুর তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ, মহাশয় মিনার্ভা থিয়েটারের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন সেই সময় শ্রীমতা তারাসুন্দরা আবার আসিয়া মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র, বি, এ মহাশয় মিনার্ভা থিয়েটার গ্রহণ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সিংহলবিজয় নাটক লইয়া থিয়েটারের উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই নাটকে কুবেণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। সিংহলবিজয় যেদিন প্রথম মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয় সেদিন অসংখ্য দর্শকে থিয়েটারে আর তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। ঐ রাত্রে শ্রীমতী তারাসুন্দরীও অভিনয়নৈপুণ্যে তাহার পূর্ব্ব গৌরব পূর্ণ ভাবেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ইহার পর মিনার্ভা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের বঙ্গনারীর অভিনয় হয়। শ্রীমতী তারাসুন্দরী ইহাতেও একটী প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকগণকে মোহিত করিয়াছিল। ইহার পর শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শুভদৃষ্টিনামক * নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই নাটকে ডোরানলিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে। তাহার পর মিনার্ভা থিয়েটারে অপরেশ বাবুর রামানুজের অভিনয় হয়। এই নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী রামানুজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকগণকে একটী নূতন ছবি

---

* লর্ড লিটনের Lady of Lyons নামক নাটকের ছায়াবলম্বনে ইহা রচিত হইয়াছিল।

দেখাইয়াছিল। ইহার মধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর খাসদখল নাটকের কয়েক দিন অভিনয় হয়। এই নাটকে শ্রীমতী তারাসুন্দরী মোক্ষদার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকগণকে এক বিচিত্র সর্ব্বমনোহর অভিনয় প্রদর্শন করে। পূর্ব্বে এই নাটকে একজন সুবিখ্যাত অভিনেত্রী এই মোক্ষদার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীমতী তারাসুন্দরীর অভিনয় তাহাপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল।

ইহার কিছু দিন পরে শ্রীমতী তারাসুন্দরী মিনার্ভা থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করে। ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরী দুইটী নূতন ভূমিকার অভিনয় করে। প্রথমটী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের কিন্নরী গীতিনাট্যে উৎপলের ভূমিকা ও দ্বিতীয়টি শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উর্ব্বশী গীতিনাট্যে একটী প্রধান ভূমিকা। এই দুই ভূমিকায় তারাসুন্দরী তাহার লঘুগম্ভীর ভূমিকার অভিনয়ে অনন্যসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ উৎপলের ভূমিকার অভিনয়ে তারাসুন্দরী অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। ঐ ভূমিকাটী এযাবৎ যেরূপভাবে প্রশংসার সহিত একজন সুদক্ষ কমিক অভিনেতা দ্বারা অভিনীত হইতেছিল, তাহা একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া তারাসুন্দরী স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে এক অভিনব সুসঙ্গত নায়কচরিত্রানুগত চিত্তহর বিশ্লেষণে চরিত্রটীর ও তৎসঙ্গে গীতিনাট্যখানিরও বিচিত্র উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। মিনার্ভায় অভিনীত কিন্নরীতে উৎপল ও মকরীই উহার নায়ক ও নায়িকা বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তারাসুন্দরীর অভিনয়ে রাজপুত্র সুধন ও কিন্নরী ভদ্রাই নায়ক ও নায়িকা, এবং উৎপল ও মকরী উহার পতাকা নায়ক ও নায়িকা বলিয়া জানিতে পারা যায়, অথচ উৎপলচরিত্রের বিশ্লেষণে

একত্র যুগপৎ ব্যাধত্ব ও আর্য্যত্ব উভয়ই পরিস্ফুট বিকসিত। ঐ চরিত্র-বিশ্লেষণে চতুর্ব্বিধ অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা তারাসুন্দরী পূর্ণমাত্রায় প্রদর্শন করিয়াছে।

উর্ব্বশী নাটক ষ্টারে অভিনয় হইবার কিছুদিন পরে শ্রীমতী তারাসুন্দরী ষ্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করে। তাহার পর অপর কোন থিয়েটারে অভিনয় করে নাই, এবং ভবিষ্যতে আর অভিনয় করিবে কিনা তাহারও আমরা সঠিক সংবাদ রাখি না। আপাততঃ তারাসুন্দরী সমস্ত থিয়েটারের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া বাটীতেই বসিয়া আছে।

উপসংহার।

শ্রীমতী তারাসুন্দরী যে বর্ত্তমান অভিনেত্রী কুলের শিরোমণি তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। সে অসঙ্খ্য নাটকে শত শত ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, এবং প্রত্যেক ভূমিকায়ই সে তাহার নিজের বিশেষত্ব দেখাইয়াছে। শিক্ষকেরা তাহাকে যেরূপ শিক্ষা দিতেন, তাহা তো সে গ্রহণ করিতই, তাহা ছাড়াও সে প্রত্যেক অভিনয়ে এমন একটী অভিনব ভাবের সৃষ্টি করিত, যাহা তাহার একেবারে নিজস্ব। সে রঙ্গালয়ে যোগদান করিয়া যত ভূমিকার অভিনয় করিয়াছে, এত ভূমিকার অভিনয় খুব কম অভিনেত্রীই

করিয়াছে। সে যখনই যে ভূমিকাটী পাইয়াছে তখনই সেটী নিখুঁত করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছে। নিজে যতক্ষণ না মনে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভূমিকাটী ঠিক আয়ত্তাধীন হইয়াছে ততক্ষণ সে কিছুতেই অভিনয় করিতে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয় নাই। এই কারণে তাঁহার কোন ভূমিকাই একেবারে কিছুই হইল না এ কথা কেহই বলিতে পারেন নাই।

তারাসুন্দরী অসংখ্য ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেকটীতেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা, চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী, হরিশ্চন্দ্রে শৈব্যা, রামানুজে রামানুজ, রিজিয়ায় রিজিয়া, বলিদানে সরস্বতী, এই কয়টী তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি, অভিনয় বিদ্যার চরম বিকাশ। উপরিলিখিত ভূমিকাগুলির অভিনয় শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সমতুল্য অন্য কোনও অভিনেত্রীর দ্বারা পূর্ব্বে কখনও হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না, এবং ভবিষ্যতে যে কখন হইবে সে আশাও নাই।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ হইতে একে একে প্রায় সব কয়টী অভিনেত্রীই বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃত চতুরঙ্গকলাকুশলা অভিনেত্রী বলা যাইতে পারে এমন আর আমরা রঙ্গালয়ে প্রায় কোথাও দেখিতে পাই না। যাহারা বা একটী দুইটি আছে তন্মধ্যে শ্রীমতী তারাসুন্দরী যদি এ সময় অভিনয় বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে বঙ্গরঙ্গালয়ের সত্যই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস শ্রীমতী তারাসুন্দরী আবার কোন রঙ্গালয়ে যোগদান করিবে এবং প্রকৃত অভিনয় করিয়া বঙ্গবাসীকে মোহিত করিবে। যতদিন শ্রীমতী তারাসুন্দরী জীবিত থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী প্রকৃত অভিনয় দেখিতে পাইবেন। তাহার পর আর বড় আশা নাই।

পরিশিষ্ট।

অনুধাবনা।

অভিনেতার, বিশেষতঃ অভিনেত্রীর, কথার উল্লেখ করিলেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ সকলের চিত্তকন্দরে একটি উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধার ভাব উদিত হইয়া থাকে। এই ভাবের পরিপোষণ যে হৃদয়ের নিতান্ত সঙ্কীর্ণতা ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সমাজমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক যেমন স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে অভিরত থাকিয়া সমাজকে নিয়ত পরিপুষ্ট ও অভ্যুন্নীত করিতেছে, অভিনেতৃগণও যে তদ্রূপ সমাজমধ্যে সৎসাহিত্যকলার শিরোমণি নাট্যলীলার অনুশীলন-দ্বারা সতত সমাজকে সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট ও অভ্যুদিত করিতেছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত না হইলেও, নাট্যানুশীলন যে সামাজিক কোনও কলানুশীলন অপেক্ষা হেয় নহে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কেননা প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলস্থ সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ সভ্যসমাজে নাট্যচর্চ্চাই তাঁহাদের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রধানতম পরিমাপক বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ গুণের গরিমা ও বরণীয়তা সম্বন্ধে কাহারও কখনও দ্বিধা হইতে পারে না; আবার নাট্যকলাও যে গুণাগ্রণী চতুঃষষ্টি কলামধ্যে প্রশস্ততমা তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং নাট্যানুশীলনের অনাদর গুণের প্রতি উপেক্ষা ও বীতশ্রদ্ধতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

কিন্তু নাট্যচর্চ্চার প্রতি যে উপেক্ষা কিংবা অনাদর বশতঃ আমাদের

দেশে শিক্ষিত সমাজ রঙ্গালয়-গমন-পরাঙ্মুখ তাহা বলিবার উপায় নাই, কেননা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যানুশীলনের উচ্চতর শ্রেণীতে বিশিষ্টরূপে রিবিধনাট্যগ্রন্থ অনুশীলিত হইয়া থাকে, কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়ই নাট্যচর্চ্চার অবসান হয় না, এমন কি সময়ে সময়ে উহাদের অভিনয় পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। তবে আমাদের রঙ্গালয়ে অনুশীলিত নাট্যাবলীতে শিক্ষিত সমাজের তাদৃশ ঘৃণা ও উপেক্ষার কারণ কি হইতে পারে? উহার একমাত্র কারণ বোধ হয় যাঁহাদিগের দ্বারা আমাদের সাধারণ নাট্যশালায় অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু আমরা সর্ব্বত্র কি এই বিচার করিয়া থাকি? আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি গ্রহণকালে কি এই বিচার পরিলক্ষিত হয়? ভগবৎ-পূজাকালে কি আমরা পূজকের জ্ঞান ও নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকি? এমন কি, শিক্ষা-গ্রহণকালে কি সর্ব্বত্র শিক্ষাদাতার আচার, ব্যবহার ও চরিত্র বিচার করিয়া থাকি? পঙ্ক হইতে যেরূপ পঙ্কজ কিংবা বিস্বাদু লবণাম্বুগর্ভ হইতে যেরূপ রত্নরাজি আহৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ আদেয় গুণরাজি দাতার গুণাগুণ নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে। নাট্যকলা যখন একটি উৎকৃষ্ট গুণাগ্রণী, তখন উহা ব্যক্তি নির্বিচারে রঙ্গালয়ের অভিনেতৃকুল হইতে গ্রহণে কি দোষ হইতে পারে?

তারপর অভিনেতা ও অভিনেত্রী বলিলেই যে নিতান্ত দূষণীয় চরিত্র বুঝিতে হইবে তাহাও সর্ব্বত্র সত্য নহে। প্রত্যুত স্থানে স্থানে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চরিত্রে এত সব অসাধারণ গুণগরিমা দেখিতে পাওয়া যায় যাহা সমাজাগ্রণীগণেও কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। উহার কারণ এই যে, যেমন

দিবারাত্র পবিত্র বাণীমন্দিরে ভারতীর আরাধনায় অধ্যাপকচরিত্র পাপ-পঙ্কিলতার বহু উর্দ্ধে স্বর্গীয় পবিত্রতা পরিবেষ্টিত থাকে, সেইরূপ অভিনয়ানুশীলনের পূর্ব্বে পাপরত থাকিলেও প্রকৃত অভিনয়সেবী নিয়ত সাধুকথার আবৃত্তি এবং সচ্চরিত্রের বিশ্লেষণে ও পাপের ভীষণ পরিণাম প্রয়োগে ক্রমশঃ উদারহৃদয়, সদনুরক্ত ও পবিত্র হইয়া উঠে। যেমন সমাজবক্ষে শত শত দুরাচার, নিয়ত পাপাভিরত ব্যক্তি আত্মগোপনের জন্য পবিত্র সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিয়া নিত্য সাধুতার অভিনয় করিতে করিতে ক্রমশঃ সৎপথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া পরিণামে সাধূত্তম হইয়া থাকে, সেইরূপ কৈশোরাবসানে যৌবনপ্রারম্ভে বহুব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়সেবী হইয়া প্রথমতঃ কেবল সখ-পূরণমানসে অভিনেতার কার্য্যগ্রহণ করিলেও কালে সাধু বাণীবিনোদ-নিকুঞ্জে সৎ নাট্যালোচনায় ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া সজ্জনাগ্রণী হইয়া উঠে। ব্যক্তিগত হিসাবে ধরিতে গেলে সর্ব্বত্রই সাধু ও অসাধু দ্বারা সমাজ বিমিশ্রিত। তাই আমরা বলিতেছি যে, শুদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ সুকুমার কলার মধ্যমণি নাট্যাভিনয়দর্শনে কাহারও ঘৃণা বা উপেক্ষা প্রদর্শন উচিত নহে।

ভাষা মানবের চিত্তগত সর্ব্ববিধ অভিপ্রায় জ্ঞাপিকা। এই ভাষা-প্রভাবেই মানব প্রধানতঃ সর্ব্ব জন্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মানবসমাজের মধ্যেও যে জাতির ভাষা যত পরিপুষ্ট ও অভ্যুন্নীত সেই জাতি সকলের বরেণ্য। জাতীয় নাট্যকলাই সেই জাতীয় ভাষার চরমোৎকর্ষের নিদর্শন, আবার অভিনেতৃগণ উহার প্রধানতম বিশ্লেষণ-কর্ত্তা, সুতরাং অভিনেতা ও অভিনেত্রী এক হিসাবে মানবের শ্রেষ্টত্বের শুভ বার্ত্তাবহ; অতএব তাঁহারা পরম শ্রদ্ধার্হ ও আদরণীয়, আদৌ ঘৃণ্য বা উপেক্ষণীয় নহে।

পণ্ডিতগণ আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক নামে যে চারি প্রকারের অভিনয় বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, উহাতে নাট্যকার বাচিক অভিনয়ের আংশিক কর্ত্তা বটে, কিন্তু আর তিন রকমের অভিনয়ের পূর্ণকর্ত্তা স্বয়ং নাট্যাচার্য্য ও তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা প্রাপ্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী। চরিত্রানুরূপ ভাবাভিব্যঞ্জক ভাষার সন্নিবেশ যেমন অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক, তদনুরূপ প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, পরিচ্ছদ ও দৃশ্য প্রকটন এবং আকৃতিগঠনও তদ্রূপ প্রতিভার পরিজ্ঞাপক। কেবল বিদ্বান্ বা বুদ্ধিমান্ হইলেই একজন নাট্যাচার্য্য, এমন কি একজন অভিনেতাও হওয়া যায় না। নাট্যাচার্য্যের, এমন কি একজন অভিনেতা হইতে হইলেও, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সর্ব্বোপরি অসাধারণ প্রয়োগ-প্রতিভা বিদ্যমান থাকা চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক অপেক্ষা একজন নাট্যাচার্য্যের প্রভিভা কোনও অংশে ন্যূন নহে। আবার প্রতিভাবান্ মেধাবী ছাত্র যেমন সুবিজ্ঞ অভিজ্ঞ অধ্যাপকের শিক্ষানুরূপ বিদ্যালাভ করিয়া সুধীসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ প্রতিভাবান্ প্রয়োগানুরাগী অভিনেতাও সুদক্ষ প্রয়োগকুশল নাট্যাচার্য্যের শিক্ষানুরূপ অভিনয়কৌশলপ্রদর্শনে সাহিত্যসেবিসমাজে অশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বাণীবিনোদমন্দিরে চিরস্থায়ী আসন প্রাপ্ত হ'ন।

কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনাপেক্ষা অভিনেতৃজীবনের পরীক্ষা গুরুতর। অভিনয়-সেবীকে পদে পদে প্রচণ্ড প্রলোভনের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই ভীষণ দ্বন্দ্বে জয়ী হইয়া অভিনয়কলায় পূর্ণ জ্ঞান লাভ বড়ই কঠিন। তাই প্রকৃত অভিনেতার সংখ্যা অতি বিরল।

আমাদের দেশে প্রতিভাবান্ সুচরিত্র যুবকগণকে অভিনয়চর্চ্চায়

কখনও উৎসাহিত করা হয় না। প্রায়ই গৃহতাড়িত, কুসঙ্গদূষিত, বিশৃঙ্খল চরিত্র যুবকবৃন্দের দ্বারা অভিনয়কলার অনুশীলন হইয়া থাকে, তাই অভিনয়কলা এত পশ্চাম্মুখী। তারপর কলানুশীলনের হিসাবে অভিনয়-চর্চ্চা শতকরা প্রায় ৯০ জনই করেন না, বাকি যে দশজন তদনুরূপ চর্চ্চা করেন, তাঁহাদেরও অনেকের প্রবল প্রলোভনের হস্তে পড়িয়া অকৃতকার্য্য হইতে হয়, অবশিষ্ট দুই একজন সফলতা লাভ করেন।

আমাদের বিদ্যালয়ে যেরূপ সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন ললিতকলার অনুশীলন হয়, রঙ্গালয়েও তদ্রূপ চতুর্ব্বিধ অভিনয়ে acting (আবৃত্তি), সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য প্রভৃতির পূর্ণ চর্চ্চা হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত প্রয়োগে দৃশ্য ও পরিচ্ছদের জন্য বিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্বের ভূরি চর্চ্চার নিতান্ত দরকার। সুতরাং রঙ্গালয় বিলাসক্ষেত্র নহে, কঠোর শিক্ষাগার। বিলাতে ও আমেরিকায় ঈদৃশ বৈজ্ঞানিক উপায়ে অভিনয় চর্চ্চা হয় বলিয়াই তথায় ষ্টেজ নিন্দার নয়, শিক্ষার মন্দির। আমাদের দেশে তাদৃশ অনুশীলন প্রায়ই হয় না, তাই নিন্দার্হ। সুতরাং দেশের সর্ব্বতোমুখী অভ্যুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সৎ সাহিত্যের সুপ্রসার-ক্ষেত্র রঙ্গালয়ের উন্নতি সাধনও যে একটি প্রধান আবশ্যক তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদের স্কুল ও কালেজে বেশীর ভাগ ideal লইয়াই থাকিতে হয়। কিন্তু ষ্টেজে সেই 'ideal'-কে 'real'-এতে প্রকটিত করিতে হয়। ষ্টেজের আশাতিরিক্ত শুভফল দর্শন করিয়াও ষ্টেজের উন্নতিকল্পে উদাসীন বলিয়াই এখনও নানারূপ সামাজিক সংস্কারে আমরা পশ্চাৎপদ। এক 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বের' ষ্টেজে অভিনয়ে যে ফল হইয়াছিল, সহস্র বক্তৃতায় তাহা হয় নাই।

বস্তুতঃ সাহিত্যের সুপ্রসারই সামাজিক অভ্যুন্নতির পরিমাপক। সৎ-সাহিত্য শিরোমণি নাট্যলীলার প্রসার কি তবে সমাজের অধোগতির পরিচায়ক? সময়োচিত একটী কথায়, একটী সঙ্গীতে, কত শত জীবনের গতি কোথায় ফিরিয়া যায় তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই বিদিত। ভগবত্-প্রাপ্তির প্রকৃষ্টতম উপায় বলিয়াই আর্য্যদেবগণ সামগান প্রবর্ত্তিত করেন। সমুদায় বেদ-মথিত হইয়া না আমাদের নাট্যকলার উৎপত্তি? সুতরাং নাট্যশাস্ত্রের প্রতি অনাদর আমাদের জাতীয় প্রশাংসার বিষয় নহে।

কেবল বহির্ভাগ দেখিয়াই কোনও বিষয়সংক্রান্ত অভিমত প্রকাশ সুধীজন নিন্দিত। 'মাকালফল' যেমন বাহ্য-সৌন্দর্য্যে বিশ্ববিমোহন হইলেও অন্তঃসার-হীনতা প্রযুক্ত নিতান্ত হেয় ও পরিত্যাজ্য, কোকিল আবার তেমনি নিতান্ত কুৎসিতকায় হইলেও কমকণ্ঠে বিশ্ববরেণ্য। ঝক্‌ঝকে হইলেই সোণা হয় না, আবার কিস্‌কিসে হইলেও অপদার্থ নহে। গলিত পঙ্কে সমুদ্ভূত হইলেও কমল যেমন সকলের আদরণীয়, তদ্রূপ বাহিরের কুলুষের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইলেও প্রকৃত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জীবনী সাদরে আলোচ্য। বিদ্যাবান্, কীর্ত্তিমান, ধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্মবীর মহাপুরুষদিগের জীবনী যেমন আমাদের অবশ্য পাঠ্য, তেমনই গুণবান্, খ্যাতিমান্, সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জ্বলন্ত জীবনবৃত্তান্ত অপাঠ্য নহে। উভয় শ্রেণীর জীবন্ত ইতিহাসই আমাদের শিক্ষাপ্রদ। বিশেষতঃ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জীবনী বিচিত্র ঘটনাবলিসংবলিত। ইহাতে পদে পদে সংসার সংগ্রামের জীবন্ত গাথা লিপিবদ্ধ, পড়িবার ও শিখিবার অনেক কথাই ইহাতে প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান। বিপথে গেলে জীবন প্রতিমুহূর্ত্তে কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হয়, প্রবৃত্তি ও বিবেকে পদে পদে কিরূপ বিষম দ্বন্দ্ব ঘটিয়া থাকে, নীচ জীবন ও উচ্চ

চিন্তাস্রোতের মধ্যে পরস্পরে কি প্রকার তুমুল সংঘর্ষ, সদালোচনার প্রাবল্যে ক্রমে ক্রমে কিরূপে জন্মগত পাপপঙ্কিলতা বিদূরিত হইয়া যায়, এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত প্রকৃত অভিনেতৃজীবনে পাঠ করিয়া পাঠকের নিকটে সংসারজটিলতার অনেক রহস্য উন্মুক্ত হয়। পরিশেষে প্রতিভার ক্ষেত্র যে সর্ব্বত্র সমান,—স্থান, কাল ও পাত্রের প্রভেদ উহাতে নাই তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

এই গ্রন্থে যে দুইটি অভিনেত্রীর জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাঁহারা উভয়েই জীবিতা,—একজন তৎসময়ে নটী-কুলরাণী হইয়া অনেককাল যাবৎ রঙ্গালয়ের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছে, আর একজন অদ্যাপি বঙ্গরঙ্গালয়ে অভিনেত্রী শ্রেষ্ঠারূপে বিরাজমানা। ইহাদের উভয়ের অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভার স্থূল বিশ্লেষণ আমাদের এই সিরিজে পূর্ব্বপ্রকাশিত 'গিরিশচন্দ্র' ও 'তিনকড়ি'তে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অনন্যসাধারণ-প্রতিভার অঙ্কুর, উন্মেষ ও বিকাশের প্রদর্শনই বর্ত্তমান গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, 'Rome was not built in a day (একদিনেই বিশাল রোমনগরী নির্ম্মিত হয় নাই)। সেইরূপ একদিনেই বিনোদিনী কিংবা তারাসুন্দরী সুদক্ষা কলাকুশলা অভিনেত্রী হইতে পারে নাই। তবে প্রতিভা নৈসর্গিকী, শিক্ষা ও প্রয়োগে প্রতিভার উৎপত্তি হয় না। অন্তর্নিহিত থাকিলে সুশিক্ষায় ও প্রয়োগে উহার ক্রমশঃ অঙ্কুরোদ্গম, উন্মেষ ও বিকাশ হইয়া থাকে। অঙ্গার শতবার ধৌত করিলেও মলিনত্ব পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ জড়মতির শত চেষ্টায়ও জ্ঞানোন্মেষ হয় না। কবিগুরু কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন—'ক্রিয়া হি বস্তূপহিতা প্রসীদতি'—পাত্রে অর্পিত বিদ্যা ফলে, অপাত্রে নহে—দর্পণই সৌরকর প্রতি-ফলিত করে, মৃৎপিণ্ড কখনও করে না। লক্ষ লক্ষ বিদ্যার্থী প্রতিদিন

বিদ্যার্জ্জনের জন্য বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পাদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কয়জন পূর্ণ বিদ্যালাভে সমর্থ হইয়া থাকে? শত শত অভিনেতা ও অভিনেত্রী রঙ্গালয়ে অভিনয় শিক্ষার্থী হইয়া প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু কয়জন উহাদের মধ্যে প্রকৃত অভিনয়বিদ্যায় শিক্ষিত হইতে পারিয়াছে? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অধিকাংশ বিদ্যার্থীই কেবল পাঠ্যগ্রন্থের অধিকাংশ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন খুব অল্পসংখ্যকেরই হইয়া থাকে, সেইরূপ রঙ্গালয়েও অধিকাংশ অভিনেতা ও অভিনেত্রী স্ব স্ব অভিনেয় ভূমিকার কেবল আবৃত্তি করিয়া যায়, চরিত্রবিশ্লেষণকারী অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংখ্যা অতি বিরল; সেই জন্যই প্রকৃত বিদ্যাবানের ন্যায় প্রকৃত অভিনেতা ও অভিনেত্রী সহৃদয় সুধী মাত্রেরই অশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদরভাজন।

বর্ত্তমান গ্রন্থে বিবৃত শ্রীমতী বিনোদিনী ও শ্রীমতী তারাসুন্দরী প্রকৃত অভিনয়কলার অনুশীলনের জন্য সহৃদয় সাহিত্যসেবিমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও সমাদরভাজন। শ্রীমতী বিনোদিনীই গিরিশচন্দ্রের আদিযুগের নাট্য-প্রতিভার প্রধানতমা বিশ্লেষিকা। শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত প্রভৃতি অভিনেত্রী বিনোদিনীর পূর্ব্ববর্ত্তিনী বটে, কিন্তু যেমন পদ্মবিকাশে নবমল্লিকার ভাতি আর থাকে না, সেইরূপ বিনোদিনীর প্রতিভার বিকাশে তাঁহাদের দীপ্তি ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছিল। বিনোদিনীর জীবনী সমালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, সে বাল্যে রঙ্গমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া একজন প্রকৃত সাধিকার ন্যায় বাণীর সেবায় অভিরত ছিল। তাহার সাধনা বিলাসিনীর বিলাসারাধনার ন্যায় নহে, উহা সর্ব্বত্যাগিনী ধ্যানময়ীর সাধনা। এই নাট্যসেবায় তাহার ত্যাগগুলি মহাযোগীর ত্যাগের ন্যায় বিস্ময়াবহ। তাই সে যে সময়ে যেরূপ

সিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অপূর্ব্ব। অনক্ষরা অনভিজ্ঞা বালিকা মাত্র ২৪।২৫ বৎসরে প্রবীণা, বিদ্যাবতী, অভিনয়কলা-কুশলা, অপূর্ব্ব-চরিত্রবিশ্লেষিকা অভিনেত্রীরাণী হইতে পারিয়াছে। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকে পর্য্যন্ত বিনোদিনীর বিচিত্র প্রতিভোন্মেষে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞের 'সতী,' নলদময়ন্তীর 'দময়ন্তী,' চৈতন্যলীলার 'চৈতন্য,' বুদ্ধদেবচরিতের 'গোপা,' বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'চিন্তামণি,' এবং কমলেকামিনীর 'শ্রীমন্ত' চরিত্রের প্রকৃত বিশ্লেষণ একমাত্র বিনোদিনীই করিয়া গিয়াছে। ইদানীন্তন কালে যে ঐ সব সুধীজন প্রিয় নাটকগুলির অভিনয় তাদৃশ প্রীতিপ্রদ হয় না উহার প্রধান কারণ ঐ চরিত্রগুলির প্রকৃত বিশ্লেষণের অভাব। যে সব অভিনেত্রী ঐ সব চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহাদের অনেকেই উহাদের প্রকৃততত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই অভিনয়ে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া কেবল কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া যায় মাত্র। আবার সময় সময় অজ্ঞতাবশতঃ বিরুদ্ধ রস ও ভাবের অবতারণা করিয়া সহৃদয় সুধীসমক্ষে কেবল উপহাসাস্পদ হয় মাত্র। বিনোদিনীর নিজের কথায়ই জানা যায় কিরূপ অদম্য উদ্যমে ও প্রাণের সাধনায় তাহাকে এক একটী চরিত্রতত্ত্ব অভ্যাস করিতে হইয়াছে। উচ্চারণ বৈচিত্র ও বেশ পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা,—এই দুইটি প্রতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সর্ব্বদা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু কয়জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী রস ও ভাব ভেদে স্বর ও আকৃতির বৈচিত্র প্রদর্শনে সুদক্ষ? গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অভিনেত্রী মধ্যে কেবল বিনোদিনী ও তিনকড়ি ইহাতে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে। স্বরবৈচিত্রে তারাসুন্দরীও সুনিপুণা, কিন্তু আকৃতি বিনিময়ে তারা ইহাদের অনেক নীচে। বিনোদিনী ও তিনকড়িকে

বিভিন্ন চরিত্রে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়াই দেখাইত, নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তি না হইলে চিনিতে পারিত না। মুস্তোফী মহাশয়ের স্বরবৈচিত্রে একটি অদ্ভুত শক্তি ছিল। তিনি কেবল রস ও ভাবানুরূপ স্বর ও আকৃতি বৈচিত্র দেখাইতেন না, বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণবৈচিত্র তাঁহার সম্পূর্ণ অধিগত ছিল। বর্দ্ধমান হইতে চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ হইতে মেদিনীপুর, কোথাকারও কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সেই জন্য তিনি কমিক (হাস্যোদ্দীপক) ভূমিকাগুলি অদ্ভুতরূপে প্রাণস্পর্শী করিয়া তুলিতেন।

সাধারণতঃ দেখিতে গেলে 'সতী' ও 'দময়ন্তী' চরিত্রে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। অধুনাতন অভিনেত্রীগণও প্রায় উভয় চরিত্রের একরূপই অভিনয় করিয়া থাকে। কিন্তু নিপুণ অভিনেত্রীর চক্ষে সতী দেবতা, দময়ন্তী মানুষী। একজন প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ দক্ষের আদরিণী কনিষ্ঠা দুহিতা, আর একজন বিদর্ভরাজের প্রিয়তমা তনয়া। সতী চরিত্রের সেই আবাল্য তাটস্থ্য, অথচ প্রাণান্ত পতিপ্রাণতা, অগাধ পিতৃভক্তি অথচ পতি নিন্দার অসহনীয়তা, বালিকার চপলতা অথচ প্রবীণার গাম্ভীর্য্য, আবার দময়ন্তী-চরিত্রে সেই সোহাগময়ী আদরিণী সখীসঙ্গে বিলাস-বিবর্দ্ধিতা রাজকুমারী, অথচ সর্ব্বগুণবিমণ্ডিতা সুগভীর প্রেমিকা, গর্ব্বশালিনী স্বয়ংবরসমাগতা দেব-মানব-প্রার্থিতা কুমারী অথচ সর্ব্বস্বত্যাগিনী পতিগতপ্রাণা রঙ্গমধ্যে সর্ব্ব সমক্ষে হৃদ্‌গত পতিপদপ্রার্থিনী, আজীবন সুখসংবর্দ্ধিতা অথচ পতি-সঙ্গে সানন্দে অরণ্যনিবাসিনী, পতির জন্য সর্ব্বত্র ভিখারিণী অথচ সতীত্বগর্ব্বিতা, এমন কি পাতিব্রত্যতেজে নিষাদভস্মকারিণী—এই সব দ্বন্দ্ব ভাবের ক্রম সমাবেশ যাহার চিত্তপটে সুপরিস্ফুট অঙ্কিত হয় নাই, যে মুকুরে পুনঃ পুনঃ এই সব পরস্পর প্রতিকূল ভাবগুলির প্রয়োগনৈপুণ্য অভ্যাস

করে নাই, তাহার দ্বারা এই সব চরিত্রের অভিনয় প্রয়াস অন্ধ ব্যক্তির চিত্রাঙ্কন প্রয়াসের ন্যায় উপহাসাস্পদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিল্বমঙ্গলের 'চিন্তামণি' চরিত্র এক বিষম দ্বন্দ্বের সমাবেশ। কিরূপে এক সামান্যা প্রেমহীনা রূপজীবিনী নারী পশ্চাৎ প্রেমিকোত্তমা হইয়া প্রেমময় ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিল তাহা কতদুর বৈষম্যসমাবেশনিপুণা অভিনেত্রীর সামর্থ্যের অনুকূল তাহা সুধী মাত্রেরই বিবেচ্য। এই কারণেই আজকাল দৃশ্য ও পরিচ্ছদ হীন সম্পূর্ণ নাট্যসম্পৎসম্পন্ন নাটকও আদৌ অভিনেয় নহে। এখন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর যুগ অতীত, আহার্য্য অভিনয়ের পূর্ণ যুগ আগত; তাই তিনকড়ি বিনোদিনী প্রভৃতির আর দরকার হয় না। পুরাতন যুগের অনুরূপ অভিনেত্রী তারাসুন্দরীও বোধ হয় রঙ্গালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিল! এক্ষণে বায়স্কোপিক দৃশ্যপট ও অদ্ভুত (বিসদৃশ হইলেও কিছু আসে যায় না) ঘাতপ্রতিঘাতের সমাবেশ থাকিলেই নাটক সকলের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান নাটকে চরিত্রাভিনয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই, একটু স্পর্শমাত্র (mere touch) থাকিলেই যথেষ্ট। বস্তুতঃ যে কৃত্রিমতা নাট্যাভিনয় হইতে বর্জ্জনই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এক্ষণে তাহাই পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাবটি প্রথমে দর্শকাকর্ষণ মানসে মার্কিণের তৃতীয় শ্রেণীর নাট্যশালায় পরিগৃহীত হইয়া ক্রমশঃ সর্ব্বত্র, এমন কি বাঙ্গালার রঙ্গালয়গুলিতে পর্য্যন্ত, সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। সুকুমার নাট্যকলার এতাদৃশ দুর্দ্দশায় সহৃদয় নাট্যামোদিমাত্রই নিতান্ত ব্যথিত ও যাতনাক্লিষ্ট।

এক্ষণে আমরা বিনোদিনীর কথাই বলিব। বিনোবিনী ৯।১০ বৎসরের সময়ে রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

উহাই তাহার প্রথম দীক্ষা। তাহার নিজের কথায়ই জানিতে পারা যায়, ঐ ভূমিকায় উপস্থিত হইতেই তাহার প্রথমে কিরূপ হৃৎ-স্পন্দন হইয়াছিল। ঐ হৃৎ-স্পন্দনটুকু ছিল বলিয়াই বিনোদিনী একজন অভিনেত্রীর রাণী হইতে পারিয়াছিল, কেননা ঐ হৃৎ-স্পন্দনই তাহার সুতীব্র কলানুরক্তি। ঐ স্পন্দন বলেই সে চৈতন্যলীলায় চৈতন্য চরিত্রের বিশ্লেষণে দর্শক-হৃদয়ে সত্যই মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষাভির্ভাব আনয়নে সমর্থ হইয়াছিল। মিসেস সিডন্‌স্‌ একদিন লেডি ম্যাক্‌বেথ ও ডেস্‌ডেমোনা চরিত্রের প্রত্যক্ষতা প্রদর্শনে বিলাতে যেরূপ মহাপণ্ডিতমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল, শ্রীমতী বিনোদিনীও সেইরূপ 'চিন্তামণি' ও চৈতন্য' চরিত্রের অভিনয়ে দর্শক বৃন্দকে তাদৃশ মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছিল। আবার তাহার মৃণালিণীর 'মনোরমা' ও মেঘনাদ-বধের 'প্রমীলা' অদ্যাপি সর্ব্বত্র আদর্শাভিনয় বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কল্পিত মধুর গম্ভীর চরিত্রাভিনয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী অদ্বিতীয়া, যেমন উৎকট, বীভৎস ও প্রচণ্ড রসাভিনয়ে তিনকড়ি ছিল অননুকরণীয়া।

কিন্তু তারাসুন্দরী এই দুই বিপরীত রসাভিনেত্রীর মধ্যবর্ত্তিনী। তাহাতে যেমন নিসর্গ মাধুর্য্যপূর্ণ অভিনয়কলা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তেমনি প্রচণ্ড ভীষণতাও দেদীপ্যমান। অভিনয় দক্ষতার অনুরূপ তাহার যদি আকৃতিবৈচিত্র থাকিত তাহা হইলে সমুদায় অভিনেত্রী সমূহকেই তাহার নিম্নে পড়িয়া থাকিতে হইত। বিনোদিনীর ন্যায় তারাসুন্দরীর নাট্যকলার প্রতিভা পূর্ণমাত্রায় আছে, কিন্তু সাধনা তাদৃশ নাই, আবার তিনকড়ি অপেক্ষা স্বরগাম্ভীর্য্য থাকিলেও আকৃতিবৈচিত্র তাদৃশ নাই। তাই তারাসুন্দরী রিজিয়ায় অদ্বিতীয়া হইলেও, জনায় তিনকড়ির সমকক্ষা নহে, আবার বিষাদে অদ্বিতীয়া হইলেও চৈতন্যে বিনোদিনীর অনেক নিম্নে। ইহারা তিন জনেই স্ব স্ব পরিবেশ-

মধ্যে অদ্বিতীয়া। হাস্যরসাভিনয়ে বিনোদিনী ও তিনকড়ি দুই দিকে দুইজন প্রবীণা। নিম্ন শ্রেণীর অভিনয়ে তিনকড়ি, উত্তম শ্রেণীর অভিনয়ে বিনোদিনী। কিন্তু তারাসুন্দরী আবার লঘুগম্ভীরাভিনয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতা। অবিমিশ্র হাস্যরসে তারাসুন্দরীর আদৌ প্রাবীণ্য নাই। বিনোদিনীর বিলাসিনী কারফর্মা প্রকৃতই অননুকরণীয়, তিনকড়ির ঝী ও দাই সম্পূর্ণ অভিনব ও স্পৃহণীয়, তারাসুন্দরীর উৎপল অভিনয়কলার এক বিচিত্র নবীন উচ্ছ্বাস। ইহারা তিন জনেই বালক ও ছদ্ম পুংবেশী নারী চরিত্রের অভিনয়ে সুনিপুণা। বিনোদিনীর চৈতন্য ও শ্রীমন্ত অতুলনীয়, তারাসুন্দরীর যাদব ও বিষাদ অভিনয়কলার চরম উৎকর্ষ, তিনকড়ির অভিমন্যু ও জহরা বিচিত্র ও অননুকরণীয়। বিনোদিনীর অভিনীত গোপা, দময়ন্তী, চিন্তামণি প্রভৃতির ভূমিকা তারাসুন্দরী অভিনয় করিয়াছে বটে, কিন্তু বিনোদিনীর সে জীবন্ত উচ্ছ্বাস তারাসুন্দরীতে লক্ষিত হয় নাই। আবার তারাসুন্দরী আয়েষা, রিজিয়া, শৈবলিনী প্রভৃতি চরিত্রের যে বিশ্লেষণ করিয়াছে তাহা অন্য কোনও অভিনেত্রীর অননুকরণীয়। সেইরূপ তিনকড়ির জনা, তারা, লেডি ম্যাকবেথ, সুভদ্রা, করমেতি প্রভৃতি চরিত্রের বিশ্লেষণ অপরের সম্পূর্ণ অননুকরণীয়। বিলাতে, ফরাসাদেশে ও মার্কিণে অভিনেত্রীদের বিশিষ্ট অভিনয়ের ফটো থাকে, তাহাদ্বারা পরবর্ত্তী কালের লোকেরা উক্ত অভিনয় সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশে ফটোগ্রাফির তাদৃশ প্রচলন হয় নাই; তাই আমরা বিনোদিনী, তিনকড়ি ও তারা-সুন্দরীর বিশিষ্টাভিনয়গুলির প্রকৃত চিত্র অর্পণে অক্ষম। সেই চিত্রগুলি থাকিলে কেবল যে নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের উপকারে আসিত তাহা নহে, নূতন অভিনয়-যাত্রীদেরও মহান্ উপকার হইত।

তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী, ইহাদের কাহাকেও রঙ্গালয়ে শিক্ষানবীশভাবে সখীশ্রেণীতে থাকিতে হয় নাই। ইহারা প্রবেশের অল্পকাল পরেই ভূমিকা পাইয়াছে। তিনকড়ি স্বাস্থ্যাভাবে রঙ্গালয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিল, বিনোদিনী মনোমালিন্যে রঙ্গালয় ছাড়িয়াছিল, তারা-সুন্দরী শরীরে অসুস্থতা নিবন্ধন সম্প্রতি কোনও রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীরূপে নাই। বিনোদিনী ২৪।২৫ বৎসরের সময়ই রঙ্গালয় ছাড়িয়া দিয়াছে, পূর্ণ প্রৌঢ়তা পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ে থাকিলে হয়তো সকলের উপরেই উঠিয়া যাইত এবং অভিনয়কলার এক নূতন পদ্ধতি রাখিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু বঙ্গ রঙ্গালয়ের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই বিনোদিনীর মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে অকালে তাহার সাধনার ক্ষেত্র রঙ্গালয়ের সম্পর্ক বর্জ্জন করিতে হইয়াছে। তিনকড়ি একরূপ আজীবন নাট্যমন্দিরে থাকিয়া বাণীর সেবা করিয়া গিয়াছে। তাই সে পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধিও লাভ করিতে পারিয়াছিল। তারাসুন্দরী প্রায় আজীবন রঙ্গালয়ে থাকিয়াও সুশিক্ষকের সমাগম তিনকড়ি ও বিনোদিনীর মত পায় নাই। প্রথম জীবনে গিরিশচন্দ্রের প্রিয়তম শিষ্য অমৃতলালের অধ্যাপকতা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু অধিক সময়ই তাহাকে নিজেই নিজের শিক্ষকতা করিতে হইয়াছে, উহার ফলে ভাষাবৈচিত্রের মধ্যে উচ্ছ্বাস ও নৈসর্গিক ভাবের বৈচিত্রে অনন্যসাধারণ প্রবীণতা লাভ করিলেও, বিভিন্ন স্বরবৈচিত্রে ও আকৃতি বৈচিত্রে তাদৃশ নিপুণতা লাভ করিতে পারে নাই। তাহার আয়েষা ও বিনোদিনীর আয়েষায় ঐটুকুই বিভিন্নতা। মোটের পর যদিও তারাসুন্দরীর আয়েষা অধিকতর পরিস্ফুট, তথাপি আকৃতিবৈচিত্রের মাত্রা ষোলকলা পূর্ণ হইলে তারাসুন্দরী সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হইতে পারিত। বস্তুতঃ তারাসুন্দরী রামানুজের অভিনয়

যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া থাকে, তাহাতে ঐ আকৃতি বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন স্বরবৈচিত্র থাকিলে উহা সর্ব্বদেশের সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠাভিনয়ের মধ্যমণি হইয়া থাকিত। বর্ত্তমান অভিনেত্রীদিগের মধ্যে মিনার্ভার কুসুমকুমারীরই মাত্র এই সব বোধ পূর্ণমাত্রায় আছে, কিন্তু তাহার গলার অভাবে সে বুঝিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। যেখানে গলার বিশেষ প্রয়োজন হয় না সেখানে কুসুমের অভিনয় অতীব চমৎকার। তাই আলিবাবার মর্জ্জিনার চরিত্র-বিশ্লেষণে কুসুমকুমারী অদ্বিতীয়া।

শ্রীমতী তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরীর মধ্যে তারাসুন্দরীই রঙ্গালয়ে অনেক অধিক বিভিন্ন জাতীয় ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছে। অনেক অভিনয় করিতে হইলেই উহাদের মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই সুবিধা-জনক হয় নাই। কুম্ভকারের সবগুলি হাঁড়ীই ভাল হয় না। বিশেষতঃ পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়কালে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ নব অভিনেত্রীকে চরিত্রটি মনের মধ্যে ঠিক অঙ্কিত করিয়া লইবার ও সময় দেন না। তাই পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ে কোথাও বড় সফলতা হয় না। এই জন্যই হয়তো গোপা, দময়ন্তী, চিন্তামণি প্রভৃতির পুনরভিনয়ে তারাসুন্দরীর অভিনয় বিনোদিনীর ন্যায় হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই! অন্যত্র বিশেষ কিছু দোষ না থাকিলেও অভিনয়ে প্রাণের বড়ই অভাব ছিল। তাহাতেই চরিত্রগুলি পূর্ব্বের ন্যায় সজীব হয় নাই। শিক্ষা দাতার অভাবেও ওরূপ হওয়া বিচিত্র নহে।

ফলতঃ প্রতিভার সর্ব্বতোমুখিতার হিসাবে আলোচনা করিতে গেলে তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী ইহারা তিনজনই বাণীর বড় পুত্রী, কেহ কাহাপেক্ষা উন বা বেশী নয়। এক এক জন এক এক পরিবেশে অনুপম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে লক্ষ লক্ষ অভাগিনী আমাদের দেশের বক্ষে

প্রতিদিন পশুজীবন যাপন করিতেছে। তাহারা যদি উপযুক্ত দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করিতে পারিত তাহা হইলে হয় ত তাহাদিগের মধ্য হইতে কত শত জন আবার শ্রীমতী তিনকড়ি, শ্রীমতী বিনোদিনী ও শ্রীমতী তারাসুন্দরীর মত অভিনয় কলায় পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইয়া সহৃদয় সুধীসমাজের শ্রদ্ধা ও সাধুবাদ লাভে উজ্জ্বল প্রভাময় জীবন যাপন করিতে পারিত, এবং সংসারে পাপের বোঝা না বাড়িয়া সুকর্ম্মজীবীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত। এদিকে কর্ম্মঠ ও প্রতিভাময় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বৃদ্ধিতে আমাদের রঙ্গালয়গুলিও দিন দিন উন্নত হইয়া অচিরাৎ ইয়োরোপীয় ও মার্কিণ দেশীয় রঙ্গালয়ের তুল্য বরেণ্য ও আদরণীয় হইত। বস্তুতঃ প্রতিভাবীজসম্পন্ন পাত্রক্ষেত্রে আচার্য্যকৃষীবলকর্ত্তৃক কর্ষিত হইয়া চিরদিন সর্ব্বত্র সুশস্যসম্পৎ প্রদান করিয়া থাকে। এই কর্ষণে সাধনারূপ সলিলবৃষ্টির নিতান্ত আবশ্যক। শ্রদ্ধা ও বিধির মধুর মিলনে অমোঘ বিত্তলাভের ন্যায় প্রতিভা ও সাধনার সুসমাবেশে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। স্থান ও শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডী প্রতিভার অসীম অনন্ত প্রসারে বর্জন করিতে হইবে। দুর্গন্ধ আবর্জ্জনা হইতেও রত্নের আহরণ যেমন অপরাধ-জনক নহে, সেইরূপ স্থানাস্থান নির্বিচারে প্রতিভা আদরণীয়। সাধারণ বিদ্যাপ্রসারে যেমন আমরা-কি পুরুষ কি নারী সর্ব্বত্র দিব্য প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ উপলব্ধি করিতেছি, সেইরূপ জাতি ও শ্রেণীর নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র কলার সুপ্রসারে ভদ্র ও অভদ্র সর্ব্ববিধ পুরুষ ও নারী মধ্যে আমরা অশেষবিধ উচ্চ প্রতিভার প্রকাশ অবলোকন করিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া থাকি। উপরে আমরা যে তিনটি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের অভিনয় প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য কোন বিদ্যাবানের প্রতিভার দীপ্তি হইতে ন্যূন?

আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া ইহারা যদি ইয়োরোপে কিংবা মার্কিণ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাণীমন্দিরে ঈদৃশ অভিনয় প্রতিভার বিকাশ প্রদর্শন করিত তাহাহইলে প্রায় সমগ্র সভ্যজগৎ ইহাদের সাধুবাদে মুখরিত হইত। কবে মাদাম আল্‌বেনি, ম্যারিয়েতা আলবোনি, সোফিয়া বাদ্দেলি, আস্‌পেসিয়া প্রভৃতি জগতে আসিয়াছিল! কিন্তু নিজ নিজ অনন্যসাধারণ গুণ-গ্রামে আজিও ইহারা প্রত্যেকে জগতে অমর, কেননা শরীরং ক্ষণভঙ্গুরং, কিন্তু কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ। বিনোদিনীর মনোরমাভিনয়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কল্পিত মনোরমাচরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া নিজকে চরিতার্থ মনে করিয়াছিলেন; তিনকড়ির লেডীমেকবেথের অভিনয়ে প্রবীণ ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকগণ, এমন কি শিক্ষিত সাহেবগণও, ইংরেজ অভিনেত্রীর অভিনয়াপেক্ষা অধিকতর দক্ষতা ও সম্পূর্ণাঙ্গতা লক্ষ্য করিয়া বিপুল প্রীতি-মহাহ্রদে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহার জনার অলৌকিক অভিনয়ে অভিনেতৃ-সম্রাট্ স্বয়ং গিরিশচন্দ্র আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন; এবং তারাসুন্দরীর শৈবলিনী, রিজিয়া ও আয়েষার অভিনয়ে সমগ্র নাট্যামোদী সুধীসমাজ একবাক্যে তাহাকে অলৌকিক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীরাণীর আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ঈদৃশ ক্ষমতাসম্পন্ন নারীত্রয় যে সর্ব্বদেশে সর্ব্ব-সুধীসমাজে বরেণ্য ইহাতে কাহারও কি অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে? যতদিন জগতে সুকুমার কলাগ্রণী নাট্যবিদ্যার সমাদর থাকিবে ততদিন অসাধারণ নাট্যবিশ্লেষিকা শ্রীমতী তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরীর নাম সর্ব্বত্র পরম সমাদরে কীর্ত্তিত হইবে।

নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের অভিনয়কলানৈপুণ্য সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক জিজ্ঞাসু আমাদিগকে অনেক দিন হইতে প্রশ্ন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের

প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ এই :—(১) গিরিশচন্দ্র একজন অনুপম নাট্যকার ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কি একজন অনুপম অভিনেতাও ছিলেন? (২) তিনি নাট্যবিদ্যা ও অভিনয়কুশলতা কোথা হইতে শিক্ষা করিলেন? (৩) তিনি কি একজন অদ্বিতীয় শিক্ষাদাতা ছিলেন? (৪) শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার ও মুস্তোফী সাহেবের মধ্যে কে দক্ষতর? (৫) গিরিশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের মধ্যে নাট্যচর্চা সংক্রান্ত কিরূপ সম্বন্ধ?

উপরি লিখিত প্রশ্নপঞ্চকের বিশদ উত্তর লিখিতে গেলে আমাদের প্রবন্ধ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, তাই উহাদের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। অনুপম নাট্যকার বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করিলেই তিনি যে একজন বিচক্ষণ অভিনেতাও ছিলেন, উহাও একরূপ স্বীকার করিতে হয়, কেন না নাট্যশাস্ত্র দৃশ্যকাব্য, উহার প্রতি চরিত্রকথিত বাক্যাবলী অভিনয় করিয়াই লিপিবদ্ধ করিতে হয়, আর গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনা বিধি ও তাহাই ছিল। তিনি বাচিক অভিনয়ের আকারে বলিয়া যাইতেন এবং একজন লেখক লিখিয়া যাইত। অভিনয় কলায় বিশেষরূপ নিপুণ না হইলে কোন চরিত্রে কিরূপ ভাষা প্রয়োগ ও কোন দৃশ্যের কিরূপ সজ্জা হইবে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে এমন হইতে পারে যে গিরিশ-চন্দ্র অভিনয় বিদ্যায় অনুপম পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু স্বরবৈচিত্র এবং সাত্ত্বিকতার অভাবে তিনি তাদৃশ অভিনেতা হইতে পারেন নাই। তাহাও ঠিক নহে। গিরিশচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য্যরূপ স্বরবৈচিত্র ছিল এবং মেকআপ বিষয়ে তিনি অদ্ভুত কৌশলবান্ ছিলেন। আমাদের গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে বিভিন্ন রসের বিশ্লেষণ কল্পে যে কয়েকটী গিরিশচন্দ্রের মৌখিক আকৃতি পরিবর্ত্তনের ফটো প্রদত্ত হইয়াছে উহাতেই তিনি কিরূপ বিভিন্ন ট্রাজিক ও কমিক

চরিত্রের বিশ্লেষণদক্ষ ছিলেন তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট। বাচিকতা ও সাত্ত্বিকতায় তিনি এতদূর কৃতী ছিলেন যে একই দৃশ্য মধ্যে তদনুরূপ বিভিন্ন রসের অভিনয় করিয়া সুধীবৃন্দকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও পুলকিত কারতে পারিতেন। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্রের মত সর্ব্ববিধ অভিনয়কলাকুশল নাট্যপণ্ডিত আমাদের দেশেতো কেহই ছিলেন না, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় সেই সময়ে কয়জন ছিলেন বলা যায় না। গিরিশচন্দ্র এই নাট্যকলাকুশলতা ও অভিনয়পাণ্ডিত্য কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এই প্রশ্নের মীমাংসা গিরিশচন্দ্রের নিজের কথায়ই বলা যাইতে পারে। তিনি কৈশোর হইতেই স্বভাবতঃ নাট্যকলা ও অভিনয় বিদ্যার নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্য যেখানেই অভিনয় হইত, কিংবা নাট্যসংক্রান্ত কোনও আলোচনা হইত শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। তদ্ব্যতীত নাট্য ও অভিনয় সংক্রান্ত অসঙ্খ্য গ্রন্থ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতেন ও নির্জ্জনে ঐ সব গ্রন্থে লিখিত ব্যবস্থামত অভিনয় করিতে চেষ্টা করিতেন। প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান জন্য তিনি কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র কেবল গ্রন্থ পাঠেই প্রীত হইতেন না, তিনি এদেশের তাৎকালিক প্রধান প্রধান বিজ্ঞান পণ্ডিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ফাদার লাফো প্রভৃতির নিকটে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। বিলাতে ও আমেরিকায় রঙ্গালয় সংক্রান্ত যত গ্রন্থ, সংবাদ পত্র ও সাময়িক প্রবন্ধ বাহির হইত তাঁহা নিয়মমত অধ্যয়ন করিতেন। সর্ব্বোপরি এসিয়া ও ইয়ুরোপে যতগুলি নাট্যগ্রন্থ তাঁহার জীবিতকাল মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অনন্যমনে পাঠ করিতেন। ফরাসী, বেলজিয়ান, নরওয়েজিয়ান, স্পেনিস ও জার্ম্মাণ নাট্যগ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতেন। গিরিশবাবুর

গৃহস্থিত লাইব্রারীটি সর্ব্বদা নাট্য ও অভিনয় সংক্রান্ত গ্রন্থে পূর্ণ থাকিত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়স্থ প্রায় কোনও অধ্যাপকই গিরিশচন্দ্রের ন্যায় সুগভীরভাবে নাট্যবিদ্যার অনুশীলন করেন নাই। তিনি কৈশোর হইতেই কবিবর ঈশ্বর গুপ্তকে কবিত্বের গুরুর আসনে উপবেশন করাইয়া একলব্যের ন্যায় কাব্যসাধনায় নিরত হন। সাধনানুরূপই তাঁহার সিদ্ধি হইয়াছিল। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্র একজন অদ্বিতীয় অভিনয়াচার্য্য ছিলেন। যে ভূমিকাটি তিনি কাহাকেও শিক্ষা দিতেন, তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কথা অভিনেতাকে পূর্ব্বে বলিতেন। তৎপরে ঐ জাতীয় কোন কোন চরিত্র সেই অভিনেতা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিতেন। পরিশেষে ভূমিকাটির ভাষাগত অর্থগুলি বেশ বুঝাইয়া দিয়া, তারপর মুখস্থ করিতে দিতেন। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্বিধ আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক অভিনয় শিখাইয়া দিতেন। তবে তাঁহার এক মহাদোষ ছিল, তিনি জটিল ও কঠোর ভূমিকা-গুলিই যত্ন করিয়া শিখাইতেন, কিন্তু ছোট খাট ভূমিকাগুলির প্রতি বড় দৃষ্টি রাখিতেন না। অভিনয় বিষয়ে যে কয়টি নূতন পন্থা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাদের সবগুলিই গিরিশচন্দ্রের উদ্ভাবিত। মুস্তোফী মহাশয় ও গিরিশচন্দ্র উভয়ই অভিনয়বিষয়ে সমান ছিলেন; মুস্তোফী মহাশয় আবার স্বরবৈচিত্রে একেবারে অনুপম ছিলেন। তবে মুস্তোফী মহাশয়ের প্রতিভা কেবল কমিক অভিনয়ের দিকেই বিশেষতঃ ধাবিত হইত, কিন্তু গিরিশ প্রতিভা সর্ব্বত্র সমান ছিল। জলধরে মুস্তোফী সাহেব অদ্বিতীয় ছিলেন বটে, কিন্তু নিমচাঁদে গিরিশচন্দ্র অভিনয়কলার চরম শেখরে উঠিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্লের যোগেশের ভূমিকায় উভয়ই রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ফলে কিন্তু মুস্তোফী সাহেব অনেক নিম্নে পড়িয়া গেলেন।

ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা গিরিশ চন্দ্রের অপরিমিত ক্ষমতার পরিচায়ক। অভিনয় শিক্ষা বিষয়ে কিন্তু গিরিশ বাবুর চাইতে মুস্তোফী সাহেব দক্ষতর।* ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চরিত্রও তাঁহার হস্তে নিস্তার পাইত না। গিরিশবাবু কেবল উচ্চ ও নূতন চরিত্র লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। পুস্তক একখানা পাইলেই গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর কোন চরিত্র কিরূপে বিশ্লেষিত হইবে তাহাই ভাবিতেন। গ্রন্থ রচনায়ও গিরিশচন্দ্র কি জাতীয় চরিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে তাহাই সর্ব্বাগ্রে ভাবিয়া তারপর রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। মুস্তোফী সাহেবও ইংরাজি ভাষায় সুবিদ্বান্ ছিলেন, গ্রন্থাদিও তাঁহার অধীত ছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ন্যায় তাদৃশ সুবিশাল সুগভীর সর্ব্বদেশীয় অধ্যয়ন তাঁহার ছিল না। থিয়েটার ও অভিনয় সংক্রান্ত নূতন কিছু উদ্ভাবনের আবশ্যক হইলে তাহা একা গিরিশবাবুই করিতেন, আর কেহ নহে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যাচার্য্য মহাশয় মুস্তোফী মহাশয়ের উপদেশেই প্রথমে তাঁহার কাশীস্থ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অভিনয় কার্য্যে যোগদান করেন। থিয়েটারে মুস্তোফী সাহেবই তাহার হাতেখড়ি দিয়াছিলেন। শেষে নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে এবং মুস্তোফী সাহেব ও গিরিশচন্দ্রের শিক্ষানৈপুণ্যে নাট্যকলায় ও অভিনয়-বিদ্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ফলতঃ নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ই এখন জীবিতদিগের মধ্যে নাট্য ও অভিনয় সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ে অদ্বিতীয় ও তৎসংবলিত সর্ব্ববিষয়ে সকলের অনুসরণীয়। সামাজিক চিত্রের উৎকট ও লঘু ভাব বিশ্লেষণে অমৃতলাল অগাধ অননুরূপ দক্ষ।

---

* মুস্তোফী সাহেব সম্পর্কিত সমুদয় কথা আমাদের এই সিরিজে প্রকাশ্য 'অর্দ্ধেন্দু-শেখরে' লিপিবদ্ধ হইবে।